মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

॥ শ্রীগুরু লাইব্রেরী ॥
॥ কলিকাতা-৬ ॥

প্রকাশক ঃ
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
রাসপূর্ণিমা, ১৩৬১

মুদ্রাকর—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

দৃশ্যাবলী

—প্রথম অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য

॥ পৌণ্ড্রগ্রামে "সরস্বতী মন্দির" সংলগ্ন বনপথ ॥

বাণীকণ্ঠ, দেবমিত্র, সত্যবতী, করীন্দম, অজামিল, বটুকেশ্বর ও কালিদাস

দ্বিতীয় দৃশ্য

॥ রাত্রিকাল ॥ দেবমিত্রের প্রাসাদকক্ষ ॥

দেবমিত্র, সত্যবতী, অজামিল, করীন্দম, বটুকেশ্বর ও কালিদাস।

তৃতীয় দৃশ্য

॥ প্রভাত ॥ সরস্বতী মন্দির সংলগ্ন মহাবন ॥

কুসুমিকা, লক্ষহীরা, মাল্যবান, কালিদাস, অজামিল, করীন্দম,
বটুকেশ্বর ও বাণীকণ্ঠ।

চতুর্থ দৃশ্য

॥ দেবমিত্রের প্রাসাদকক্ষ ॥

দেবমিত্র, সত্যবতী ও কালিদাস।

ড্রপ

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য

॥ উজ্জয়িনীতে লক্ষহীরার প্রাসাদকক্ষ ॥

নাগদত্ত, শূরসেন, কুসুমিকা, লক্ষহীরা, কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য

॥ সরস্বতী মন্দির সংলগ্ন বন ॥

সত্যবতী ও বাণীকণ্ঠ।

তৃতীয় দৃশ্য

॥ রাত্রিকাল ॥ উজ্জয়িনীর কন্দর্পমন্দির সংলগ্ন উপবন ॥

বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, লক্ষহীরা, নাগদত্ত, কুসুমিকা, শূরসেন ও সত্যবতী।

ড্রপ

—তৃতীয় অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য

॥ কালিদাসের উজ্জয়িনীর গৃহ প্রকোষ্ঠ ॥

কালিদাস, সত্যবতী, বিক্রমাদিত্য ও বাণীকণ্ঠ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

॥ ইন্দ্রনীল প্রাসাদ সান্নিধ্য ॥

বাণীকণ্ঠ, বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, জয়সেন ও শূরসেন।

তৃতীয় দৃশ্য

॥ ইন্দ্রনীল প্রাসাদের কক্ষ ॥

নাগদত্ত, লক্ষহীরা, শূরসেন, কালিদাস, বিক্রমাদিত্য, বাণীকণ্ঠ ও জয়সেন।

শাপমুক্তি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(পৌণ্ড্রগ্রামে সরস্বতী মন্দির সংলগ্ন বনপথ।)

(বাণীকণ্ঠ, পৌণ্ড্ররাজ দেবমিত্র ও তাঁর কন্যা সত্যবতীর প্রবেশ)

বাণীকণ্ঠ—তুমি এ কি প্রতিজ্ঞা করেছ মা? তুমি নাকি সঙ্কল্প করেছ তর্ক-যুদ্ধে তোমাকে যে জয় করতে পারবে সেই হবে তোমার স্বামী। কে তোমাকে পরাস্ত করবে? কোথায় ভারতীর সেই বর পুত্র? কেন এ দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করলে মা?

দেবমিত্র—বলুন ব্রাহ্মণ, আপনিই ওকে বুঝিয়ে বলুন। কত দেশ দেশান্তর হতে কত রাজপুত্র এল, কত সৌম্যকান্তি তরুণ বিদ্যার্থী এল, কিন্তু সবাই তর্ক-যুদ্ধে হার মেনে লজ্জায় দেশে ফিরে গেল। আমার কন্যার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা আমি কিছুতেই ভাঙতে পারলুম না। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন—

বাণীকণ্ঠ—মা!

সত্যবতী—দেব, আপনি সরস্বতী মন্দিরের পূজারী। শাস্ত্র-বাক্য আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেব সে স্পর্ধা মার্জনা করবেন। শাস্ত্রে বলে, স্বামী স্ত্রীর জীবনের একমাত্র

আরাধ্য দেবতা। স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতা নারী জীবনে আর কেউ নেই।

বাণীকণ্ঠ—জানি মা, এই তো আর্য-নারীর জীবনের বেদমন্ত্র।

সত্যবতী—তাই যদি হয়, তবে যে পুরুষ, পত্নীর চেয়ে জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠ নন, তাঁকে কেমন করে বিবাহ করা সম্ভব? বিদ্যায় বুদ্ধিতে যিনি শ্রেষ্ঠতর নন, তাকে কেমন করে উপাস্যদেবতা জ্ঞান করব?

দেবমিত্র—তোমার কথা বুঝি সত্যবতী। কিন্তু ধরো, যদি তোমার চেয়ে পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ এমন কোন পুরুষের সন্ধান না পাই, তখন তোমায় তো চিরকুমারী হয়ে থাকতে হবে?

সত্যবতী—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে আমা অপেক্ষা যে পুরুষ নিকৃষ্ট তার গলায় বর-মাল্য দেওয়ার মত চরম লাঞ্ছনা আর কিছু হতে পারে না বাবা। বরং চিরকুমারী ব্রত পালন করব সেও অনেক ভাল।

বাণীকণ্ঠ—মা, বোধহয় তোমার এই দুর্জয় প্রতিজ্ঞার পথ ধরেই এমন কোনো মহাশক্তিধরের আবির্ভাব হবে যিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় সারা ভারতবর্ষে, ভারত দিগন্ত ছাড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করবেন।

দেবমিত্র—চলুন প্রভু, আমরা দেবী সরস্বতীর কাছে সেই প্রার্থনা জানাতেই তাঁর মন্দিরে এসেছি।

বাণীকণ্ঠ—চলো মা, দেবীর মন্দিরে চলো।

[সকলের প্রস্থান

(করীন্দম, বটুকেশ্বর ও অজামিলের প্রবেশ)

অজামিল—বলো তো ভাই, এই দাম্ভিকা রাজকন্যাকে কি করে জব্দ করা যায় বলোতো? যে আসছে তাকেই হারিয়ে দিচ্ছে, আর দিন দিন দেমাক বেড়ে যাচ্ছে।

বটুকেশ্বর—ফুলছে, দেমাকে ফুলছে।

করীন্দম—অত ফোলা ভাল নয়, ফুলতে ফুলতে শেষে একদিন একেবারে ফট্ ফটাস—যাকে বলে কুমড়ো পটাস। হ্যাঁ, তোমরা দেখে নিও।

অজামিল—কিন্তু আর যে সহ্য হচ্ছে না। যেখানে যাই, সবাই ঠাট্টা করে। আব মেয়েছেলেরা তো হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে। সেদিন আমাদের গয়লানিটা দুধ জোগান দিতে আসেনি। পথে হঠাৎ দেখা, ধমকে জিজ্ঞেস করলুম, এই, দুধ দিসনি কেন রে? উত্তরে কি বললে জান?

করীন্দম—কি বললে?

অজামিল—বললে ঠাকুর, এখন থেকে আর দুধ দেব না, ঘোল দেব।

করীন্দম ও বটুকেশ্বর—ঘোল!

অজামিল—হ্যাঁ, বলে, মেয়েছেলের কাছে হেবে যাওয়া পুরুষকে আর দুধ খাওয়াব না, ঘোল খাওয়াব। শুধু খাওয়ান কি, মুচকি হেসে বলে গেল—মাথা মুড়িয়ে সেই মসৃণ মাথায় নাকি আদর করে ঘোল ঢেলে দেবে!

বটুকেশ্বর—সে ঘোলের আবার দামও নেবে না বলেছে শুনলুম!

করীন্দম—ওঃ, সত্যি মৃত্যুতুল্য অপমান। আর আমাদের সকলের এ অপমান, এ লাঞ্ছনার মূলে রয়েছে ওই দাম্ভিকা রাজকন্যা সত্যবতী। এর যোগ্য প্রতিশোধ হয়, যদি কোনো রকমে একটি গণ্ডমূর্খকে ধরে এনে ওর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়।

বটুকেশ্বর—ঠিক বলেছ, শুধু গণ্ডমূর্খ নয়, যাকে বলে একেবারে নিরেট গণ্ডমূর্খ।

অজামিল—চলো, সেই রকম একটি মূর্খের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। সেই মূর্খের সঙ্গে কলে কৌশলে রাজকন্যা সত্যবতীর বিয়ে ঘটানোই এখন থেকে আমাদের একমাত্র কাজ। কি বল ?

করীন্দম—নিশ্চয়। চলো খুঁজে দেখি কোথায় সেই নিরেট বস্তুটিকে পাওয়া যায়। চলো—

(অজামিল, বটুকেশ্বর ও করীন্দম প্রস্থানোদ্যত। নেপথ্যে কুঠার দিয়া কাঠ কাটার শব্দ। অজামিল দাঁড়াইয়া পড়ে।)

অজামিল—ওহে করীন্দম, ওহে বটুকেশ্বর, থামো থামো—

করীন্দম ও বটুকেশ্বর—কেন ? কি হল ?

অজামিল—ঐ দেখ, ঐ গাছটার দিকে লক্ষ্য করো।

করীন্দম—কি ? ওতো একটি লোক গাছে উঠে কাঠ কাটছে !

অজামিল—কাঠ তো কাটছে, কিন্তু কোথায় বসে ?

বটুকেশ্বর—বড় ডালটার আড়ালে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছি না।

অজামিল—এই দিকে সরে এসো, এইবার দেখ—

করীন্দম - কি সর্বনাশ, যে ডালে বসেছে, কুড়ুল দিয়ে সেই ডালই কাটছে !

বটুকেশ্বর—এখুনি পড়ে যাবে যে—

অজামিল—(উদ্দেশ্যে) ওহে বাপু, আর কেটো না—আমাদের কথা শোন, নেমে এসো—

কালিদাস—(নেপথ্য হইতে) আমায় বলছ ?

অজামিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোনো—গাছ থেকে নেমে এই দিকে এসো।

কালিদাস—(নেপথ্য হইতে) যে আজ্ঞে আসছি—

অজামিল--করীন্দম, বটুক, বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। আমরা যা খুঁজছিলাম তা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেছি।

করীন্দম—যা বলেছ ভায়া, যে ডালে বসে, সেই ডালই যে কাটে, তার চেয়ে গণ্ডমূর্খ পৃথিবীতে আর কে আছে ?

বটুকেশ্বর—একে নিয়েই এখন দুর্গা বলে ঝুলে পড়া যাক্।

(কালিদাসের প্রবেশ)

কালিদাস—আমি এসেছি। আজ্ঞা করুন।

করীন্দম—ওহে বাপু, তুমি যে ডালে বসেছিলে সেই ডালটি কাটছিলে কেন ? ডাল যখন কাটা হবে তখন ডালশুদ্ধ তুমিও যে পপাত ধরণী তলে।

কালিদাস—পপাত ! পপাতো কি ?

বটুকেশ্বর—পপাত বোঝ না ? মানে, পড়ে যাবে।

কালিদাস—পড়ে যাবো ?

অজামিল—হ্যাঁ, ডালশুদ্ধ মাটীতে পড়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে মরবে।

কালিদাস—মরে যাব? ও বাবা, তাওতো বটে, এটা তো আমার মাথায় আসেনি, আপনারা আমাকে খুব বুদ্ধি করে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তো! কী ছুঁচোলো বুদ্ধি আপনাদের। বুদ্ধি তো নয়, যেন ছুঁচ। আপনারা প্রণাম নিন আমার।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

করীন্দম—হয়েছে, হয়েছে, ওঠো। শোনো, তুমি কি জাতি?

কালিদাস—আজ্ঞে পুরুষ জাতি।

করীন্দম—সে তো দেখতে পাচ্ছি। বলছি, তুমি কি?

কালিদাস—আমি কি? আমি একটি মনুষ্য।

বটুকেশ্বর— মনুষ্য, তুমি একটি কুপোষ্য।

কালিদাস—কূপ অশ্ব' কূপ অশ্ব! কুঁয়ো ঘোড়া! আজ্ঞে না, ঘোড়া কুঁয়োতে থাকে না তো, আস্তাবলে থাকে, ঘাস খায়, আর চিঁহি চিঁহি ডাকে।

অজামিল—বেশ, বেশ, তোমার বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হলাম। তোমার নামটি কি বলতো?

কালিদাস—আজ্ঞে কালিদাস। নাঃ শ্রীকালিদাস শর্ম্মা।

করীন্দম—তুমি ব্রাহ্মণ?

কালিদাস—শুধু ব্রাহ্মণ হব কেন? আমি গো-ব্রাহ্মণ।

বটুকেশ্বর—গো-ব্রাহ্মণ!

কালিদাস—আজ্ঞে, পণ্ডিতমশাই আদর করে ওই উপাধি দিয়ে পাঠশালা থেকে ছেড়ে দিলেন। বললেন, তোমাকে দেবার

মত বিদ্যে আর আমার ভাঁড়ারে নেই। সব ফুরিয়ে গেছে। কতটা পড়েছ কেউ জিজ্ঞাসা করলে বোলো—আমি গো-ব্রাহ্মণ, বিদ্যেতে একেবারে ঢন্ ঢন লবডঙ্কা।

করীন্দম—বেশ, বেশ। এইবার শোনো বাপু কালিদাস, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।

কালিদাস—কি কাজ ?

করীন্দম—তোমায় একটি বিয়ে করতে হবে।

কালিদাস—বিয়ে ?

বটুকেশ্বর—হ্যাঁ, তুমি বিয়ে করতে রাজী তো ?

কালিদাস—অরাজী হই কি করে ? আমার মা মরবার সময় ওই কথাই বলে গেছেন। বললেন, কালিদাস, জীবনে আর তো কিছু পারলে না বাবা, তবে, একটি বিয়ে কোরো। দুধে আলতায় রাঙা বউ এনো। তারপর শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে পুত্তুর মুখ দেখো। নইলে নরক ভোগ হবে। তাই বিয়ে তো একটা করতেই হবে। কিন্তু ভাবছি কোথায় পাই ?

অজামিল—ভেবো না। তোমার পছন্দমত রাঙা টুকটুকে বউ এখানেই পাবে।

বটুকেশ্বর—ঐ মন্দিরে গেছে পূজো দিতে।

কালিদাস—ঐ মন্দিরে ?

করীন্দম—হ্যাঁ, রাজকন্যা, একেবারে অপ্সরার মত সুন্দরী। তাকে যদি বিয়ে করতে চাও—তাহলে আমাদের কথামত তোমাকে চলতে হবে।

বটুকেশ্বর—আমরা যা বলব তাই করতে হবে।

কালিদাস—কি করব বলুন ?

অজামিল—শোনো, রাজকুমারী এখনই এই পথ দিয়ে প্রাসাদে যাবে। ও পণ করেছে বিদ্যায় বুদ্ধিতে যে ওকে হারিয়ে দেবে তাকে ও বিয়ে করবে। আমরা তোমাকে দেখিয়ে বলব যে, তুমি পৃথিবীর মধ্যে সবার চেয়ে বুদ্ধিমান।

কালিদাস—কিন্তু, পণ্ডিতমশাই যে বলেছে একজন আমার চেয়েও নাকি বুদ্ধিমান।

বটুকেশ্বর—তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান, সে আবার কে ?

কালিদাস—কেন ? আমাদের বাড়ীর পাশের ধোপানীর গাধাটা!

অজামিল—তা হোক। সে তো আর রাজকন্যাকে বিয়ে করতে আসবে না—রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার। তুমি সভায় গিয়ে রাজকন্যার সঙ্গে তর্ক করবে।

কালিদাস—কি তক্ক ?

করীন্দম—তর্কও তোমাকে করতে হবে না। আমরা বলব তুমি মৌনী, মৌনব্রত ধারণ করেছ।

কালিদাস—কি ধারণ করেছি ?

বটুকেশ্বর—মৌনব্রত।

কালিদাস—সে আবার কি ?

করীন্দম—মানে হচ্ছে এই, তুমি কারো সঙ্গে কথা বল না। কেবল ইশারায় সব বুঝিয়ে দাও। রাজকন্যাকে বলব ইশারায় তোমাকে প্রশ্ন করতে—তুমিও ইশারায় তার উত্তর দেবে।

কালিদাস—আমায় যদি ঠেঙ্গিয়ে দেয় ?

করীন্দম—ঠেঙ্গিয়ে দেবে !

কালিদাস—জানো না, ভট্চায্যি বাড়ীর পদিকে ওপাড়ার মুকুন্দ না, এই পদি, এই পদি, বলে ডেকেছিল, আরচোখে এমনি করে ইশারা করেছিল। সবাই মুকুন্দকে ধরে খুব ঠেঙ্গালে। না বাপু, আমি কোন ইশারা করব না।

অজামিল—আঃ শোনো শোনো। ওরকম চোখের ইশারা নয়। সভায় বসে রাজকন্যা হাত তুলে আঙ্গুল দিয়ে তোমাকে যেমন প্রশ্ন করবেন, তুমিও আঙ্গুল তুলে তার জবাব দেবে।

কালিদাস—ওঃ, চোখে চোখে নয়, আঙ্গুলে আঙুলে ইশারা ?

অজামিল—হ্যাঁ, আঙ্গুলে আঙুলে ইশারা। তোমার যেমন খুশি, যে কটা আঙ্গুল ইচ্ছে তাই নেড়ে ইশারা কোরো।

বটুকেশ্বর—আমরা কাছে থাকব, তোমাকে ঠিক জিতিয়ে দেব।

করীন্দম—ঐ বুঝি তারা এসে পড়ল।

কালিদাস—কোথায়, বউ কোথায় দেখি !

করীন্দম—আঃ এখন নয়, চট্ করে ঐ পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে একটু ভদ্রস্থ হয়ে নাও। হাজার হোক, বিয়ে করতে যাচ্ছ, একটু সাজবে না ?

কালিদাস—তাহলে চট্ করে বাড়ীতে ছুটে গিয়ে একটু সেজেই আসি, যেন বর বর দেখায়।

করীন্দম—তাই যাও, শিগ্গীর।

কালিদাস—যাচ্ছি, হ্যাঁ একেবারে টোপর পরে আসবো ?

করীন্দম—না, না, টোপোর পরবে কি ?

বটুকেশ্বর—আগে রাজকন্যাকে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে হারাতে হবে তো।

কালিদাস—ওঃ, তাহলে যাই বরং পুঁথীপত্তর নিয়ে আসি।

[ছুটিয়া প্রস্থান

অজামিল—করীন্দম, বটুক, এরা এসে গেছে।

(মন্দির দিক হইতে দেবমিত্র ও সত্যবতীব পুনঃ প্রবেশ)

সকলে—জয়োঽস্তু মহারাজ দেবমিত্র।

দেবমিত্র—কে ?

করীন্দম—মহারাজ, আমরা তিনটি দীন ব্রাহ্মণ।

দেবমিত্র—ব্রাহ্মণ, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। মনে হচ্ছে আপনাদের যেন কোথায় দেখেছি !

সত্যবতী—আমার মনে হচ্ছে বাবা, ওঁরা সকলেই তর্ক সভায় এসেছিলেন।

দেবমিত্র—ওঃ, আপনারাও পরাজিত পণ্ডিত ?

করীন্দম—সে লজ্জার কথা আর বলবেন না মহারাজ।

বটুকেশ্বর—লজ্জায় মরমে মরে আছি।

সত্যবতী—কিন্তু তবু মৃত্যু হয়নি।

অজামিল—আত্মহত্যা করব বলেই জলে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলাম।

সত্যবতী—সে জল নিশ্চয়ই বিশুষ্ক পুষ্করিণীর ?

করীন্দম—তা তা—

সত্যবতী—এসো বাবা, আমরা প্রাসাদে যাই।

অজামিল—কিন্তু আমাদের কিছু নিবেদন ছিল মহারাজ !

দেবমিত্র—বলুন—

অজামিল—আজ দৈবের নির্দেশে এমন একজন মহাপুরুষের সন্ধান পেয়েছি—মানবের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত তাঁর নখদর্পণে।

করীন্দম—যাঁর পাণ্ডিত্যে রাজকন্যা সত্যবতী তো তুচ্ছ, মনে হয় স্বয়ং বাগ্দেবীও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবেন।

সত্যবতী—ভাল, তাঁকে আজই, এই মুহূর্তে রাজগৃহে পাঠিয়ে দেবেন, আমি তার সঙ্গে আলাপনের জন্য তর্ক-সভায় প্রতীক্ষা করব।

অজামিল—কিন্তু এক কথা। তিনি এ সময় মৌনব্রতধারী, রাজকন্যার যা কিছু জিজ্ঞাস্য যদি ইঙ্গিত দ্বারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন তবে আমরা তাঁকে রাজগৃহে পদধূলি দেবার জন্য অনুরোধ করতে পারি—

সত্যবতী—উত্তম, ইঙ্গিতেই জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু তিনি এখন কোথায় ?

বটুকেশ্বর—ঐ যে ভগবান কালিদাস এই দিকেই আসছেন।

করীন্দম—আহা, প্রভুর কি অলৌকিক মানসিক শক্তি! রাজকন্যা তাঁর সঙ্গে ইঙ্গিতে তর্ক যুদ্ধ করতে চান বুঝতে পেরে তিনি নিজেই এই দিকে আসছেন !

অজামিল—সুস্বাগত ভারত-গৌরব,

বটুকেশ্বর—সর্বশাস্ত্র সিন্ধু মন্থন শেষ অমৃতপায়ী,

করীন্দম—মন্দার পর্বত ঘর্ষণ সঞ্জাত হলাহল কণ্ঠাশ্রয়ী,

অজামিল—শ্রীশ্রী শ্রীমান্—

বটুকেশ্বর—বিবুধগণ ভূষণ,

করীন্দম—পাণ্ডিতাগ্রগণ্য কালিদাস,

সকলে—দেব দেব মহাদেব, সুস্বাগতম্—সুস্বাগতম্—সুস্বাগতম্।

(তিনজনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। কালিদাস হাত তুলিয়া আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।)

দেবমিত্র—সত্যবতী, এঁকে তর্ক সভায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাই, কেমন ?

সত্যবতী—না পিতা, বৃথা তর্ক করতে আর ইচ্ছা হয় না। আগে এঁকে একটু পরীক্ষা করে নিন।

দেবমিত্র—কি পরীক্ষা করব ?

সত্যবতী—যা হয়, দু একটি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। জিজ্ঞাসা করুন তো ওর এই মৌনব্রত কতদিনের।

দেবমিত্র—পণ্ডিতবর, আমার কন্যা জানতে ইচ্ছা করেন, আপনার এ অবস্থা কতদিনের ?

(কালিদাস এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন বুঝিতে না পারিয়া কনুই দ্বারা অজামিলকে খোঁচা দিলেন ও মুখ বিকৃত করিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কি উত্তর দিবেন।)

সত্যবতী—একি, ব্রাহ্মণ বানরের মত বারবার মুখ বিকৃতি কচ্ছে কেন ?

দেবমিত্র—তাইতো, ব্রাহ্মণের এ বানরোচিত মুখ বিকৃতি কেন ?

অজামিল—বুঝতে পারলেন না মহারাজ ? আপনি প্রভুকে

জিজ্ঞাসা করেছেন -এ অবস্থা কতদিনের। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় শাস্ত্রেই এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। উনি নিজেকে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি জ্ঞানে প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করছেন কোন্ অবস্থার কাল নির্ণয় করতে চাইছেন ? প্রাচ্য মতে মনুর সন্তান মানব রূপে অবস্থানের কাল ? অথবা পাশ্চাত্য মতে মানবের আদিপুরুষ বানর রূপে অবস্থানের কাল ?

দেবমিত্র বানর রূপে অবস্থান ?

করীন্দম—হাঁ মহারাজ, পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের বানরের বংশধর বলে প্রচার করে গৌরব বোধ করে থাকেন। আমাদের প্রভু দন্ত বিকাশ ও নাসিকা কুঞ্চন করে সেই অবস্থার কথাই ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছিলেন।

দেবমিত্র—ওঃ কি অগাধ পাণ্ডিত্য! পাশ্চাত্য শাস্ত্রও এমন ভাবে আয়ত্ত করেছেন উনি! জানতে বড় ইচ্ছা জাগে পণ্ডিতপ্রবর, কতগুলি শাস্ত্র গ্রন্থ আপনি আজ পর্যন্ত আয়ত্ত করেছেন ?

(কালিদাস গর্বভরে দুইখানি পুস্তক যাহা সঙ্গে আনিয়াছিলেন দেবমিত্রের হাতে দিলেন। দেবমিত্র পুস্তকের নাম দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।)

দেবমিত্র—একি! কি শাস্ত্র! ‘সরল ধারাপাত’ আর ‘আদর্শ বর্ণপরিচয়’। ধারাপাত ও বর্ণপরিচয়!

(অজামিল, বটুকেশ্বর ও করীন্দম পরস্পর পরস্পরের

প্রতি হতাশা ব্যঞ্জক ইঙ্গিত—যাহার অর্থ সব চাতুরী এইবার শেষ হইয়া গেল।)

দেবমিত্র—ব্রাহ্মণ, এই কি বিদ্যাবারিধির বিদ্যার বহর ?

অজামিল—ঠিক ধরেছেন মহারাজ, উনি বিদ্যার বারিধি। আপনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছেন উনি কতগুলি শাস্ত্র গ্রন্থ আয়ত্ত করেছেন। শাস্ত্র জ্ঞান কি পুস্তকের সংখ্যা দিয়ে, অঙ্ক কষে নির্ণয় করা যায় মহারাজ ? এই প্রশ্নই প্রভু আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনার হাতে প্রথমে ঐ ধারাপাতখানি দিয়ে।

করীন্দম—তারপর দিলেন বর্ণপরিচয়। বর্ণপরিচয় দিয়ে প্রভু বোঝাচ্ছেন জ্ঞানের সমুদ্র অসীম ও অনন্ত, জ্ঞান-সমুদ্রের তটভূমিতে বসে উনি আজ পর্যন্ত যা কিছু আহরণ করেছেন তাকে বলা যায় বর্ণপরিচয় মাত্র।

বটুকেশ্বর—অহো, প্রভু হে, বিদ্যাবিনয় অবতার হে, আমাদের আর একবার পদধূলি দিন। (প্রণাম)

দেবমিত্র—সত্যবতী ?

সত্যবতী—ওঁকে তর্ক-সভায় নিয়ে আসুন পিতা, সেইখানেই সব সন্দেহের অবসান হবে।

দেবমিত্র—আসুন পণ্ডিতবর, দয়া করে রাজগৃহে আমাদের তর্ক-সভায় আগমন করুন।

অজামিল—চলুন মহারাজ। আমরা প্রভুকে নিয়ে যাচ্ছি। আসুন প্রভু—

[সকলের প্রস্থান

(গান গাহিতে গাহিতে পুষ্পপাত্র হস্তে বাণীকণ্ঠের প্রবেশ ও গীতান্তে প্রস্থান।)

গান

নমো পুণ্যতপোবন স্নিগ্ধ শমাবণ
স্তুরভিত হোম হবি গন্ধ।
নমো বনস্পতি নদী মধুমতী
তরঙ্গলালিত ছন্দ ॥
ভারতঋষি গীত নমো সামগাথা
পূরব অচলে নমো আলোক বিধাতা।
নমো মঙ্গলময়ী অযি আশ্রম মাতা
তরলতা জীবন আনন্দ ॥

(অপর দিক হইতে ধাবমান কালিদাস ও তার পশ্চাতে করীন্দম, বটুকেশ্বর ও অজামিলের প্রবেশ)

সকলে—ও কালিদাস, শোনো—শোনো—

কালিদাস—না বাবা, শুনব না, ওই বুঝি ধরলে।

করীন্দম—(কালিদাসের হাত ধরিয়া) ভয় পাচ্ছ কেন? কে তোমাকে ধরবে?

কালিদাস—ঐ রাজসভার লোকেরা। ধরে বেদম ঠ্যাঙানি দেবে। শুনছ না ঐ তারা গোলমাল করে ছুটে আসছে! দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

বটুকেশ্বর—একি বোকামি করছ? তোমায় ধরবে কি? ওরা তোমার জয়ধ্বনি করছে। বলছে, জয় কালিদাসের জয়।

কালিদাস—কালিদাসের জয়? কিন্তু ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। গিয়ে মুস্কিলে পড়বো না তো?

অজামিল—আবার কিসের মুস্কিল? রাজকন্যাকে তো তুমি তর্কে হারিয়ে দিয়েছ?

কালিদাস—তক্ক! তক্ক হোল কোথায়? আমিতো তোমাদের শেখান মত চুপ করেছিলাম।

বটুকেশ্বর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইশারায় তর্ক। মনে নেই, রাজকন্যা তোমার দিকে একটি আঙ্গুল তুলে ইশারা করেছিলেন!

কালিদাস—একটি আঙ্গুল তুললো, আমি ভাবলুম, আমায় বলছে, 'চুপ'। আমিতো চুপ করেই ছিলাম—তবু আঙ্গুল তুলে বলে 'চুপ'। তাই আমি রেগে গেলুম, রেগে দুহাতের দুটো বুড়ো আঙ্গুল তার দিকে বাড়িয়ে দিলুম। মনে মনে গালাগাল দিয়ে বললুম—'খা কাঁচকলা'। খুব চটে গেছে রাজকন্যা, না?

করীন্দম—উঁহু! চটেনি। বরং তোমার কাছে হেরে গিয়ে লজ্জা পেয়েছে।

কালিদাস—কিসে বুঝলে?

করীন্দম—শুনলে না, আমরা বললুম রাজকন্যা একটি আঙ্গুল তুলে বোঝাচ্ছেন, জগতের স্রষ্টা একজন, তিনি হচ্ছেন পুরুষ। আর তার জবাবে তুমি দুটি আঙ্গুল দেখালে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, না, স্রষ্টা একজন নয়, দুজন—পুরুষ এবং প্রকৃতি।

বটুকেশ্বর—ব্যাখ্যা শুনে সবাই বলে উঠল জিতেছে, পণ্ডিত কালিদাসের জয় হয়েছে।

কালিদাস—কি জানি বাপু, ওসব আমি বুঝি না। আমি

ভাবলুম কি রাজকন্যা রেগে গিয়ে চড় দেখাল। আমিও অমনি তাকে কিল দেখিয়ে সভা ছেড়ে দে ছুট দে ছুট। তাইতো রাজার লোকেরা ধর ধর বলে আমায় ধরতে আসছে। হ্যাঁ গা, আমায় ধরবে না তো? আমার ভয় লাগছে যে—

অজামিল—কিসের ভয়? আমরা কিল চড়ের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করে এসেছি। প্রমাণ হয়ে গেছে চড়ের বদলে কিল দেখিয়ে তুমি জিতেছ।

কালিদাস—সত্য বলছ, প্রমাণ করেছ?

অজামিল—নিশ্চয়ই প্রমাণ করেছি। আমরা সভাস্থ সকলকে বললুম, রাজকন্যা হাতের পাঁচটি আঙ্গুল দেখিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীর স্রষ্টা হল পঞ্চভূত। আর আমাদের প্রভু কালিদাস তার উত্তরে পাঁচটি আঙ্গুল একত্র করে একটি মুষ্টি দেখিয়েছেন। পাঁচ আঙ্গুল এক সঙ্গে করে একটি মুষ্টি দেখাবার মানে হচ্ছে, পঞ্চভূত নিয়েই জগৎ, কিন্তু তার সৃষ্টিকর্তা হলেন একটি মুষ্টি, মানে একজন, অর্থাৎ ভগবান। সবাই বললে 'জয় পণ্ডিত কালিদাসের জয়'।

(নেপথ্যে—জয় পণ্ডিত কালিদাসের জয়। জয় পণ্ডিত কালিদাসের জয়।)

কালিদাস—ও বাবা, ওই আসছে, ধরবে আমাকে—

(সসৈন্যে রাজা দেবমিত্রের প্রবেশ)

অজামিল—আসুন মহারাজ, আসুন—

দেবমিত্র—এই যে মহাপণ্ডিত কালিদাস এখানে রয়েছেন। আসুন পণ্ডিতপ্রবর, আপনার হস্তে আমার কন্যাকে সম্প্রদান করে, আমি ধন্য হই,—একি! নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? সভাস্থলে তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করে আপনি পালিয়ে এলেন কেন, আমরাতো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

অজামিল—মহারাজ, প্রভুর লজ্জা হয়েছে। সংসার ত্যাগী পুরুষ কি না। একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে, মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে হবে।

বটুকেশ্বর—আপনি অগ্রসর হোন, আমরা একটু পরেই প্রভুকে নিয়ে বিবাহ সভায় যাচ্ছি।

দেবমিত্র—বেশ, আপনাদের যেমন ইচ্ছা। অধিক বিলম্ব করবেন না। প্রথম লগ্নেই শুভকার্য শেষ করতে চাই।

করীন্দম—সে তো আমাদেরও ইচ্ছা মহারাজ, কোনো রকমে চোখ-কান বুজে একবার সাতপাক ঘুরিয়ে দিতে পারি— ব্যাস, আমাদেরও তখন পায় কে? আপনি যান, বিবাহের আয়োজন করুন গে।

[দেবমিত্র ও প্রহরীদের প্রস্থান

অজামিল—কালিদাস, ঘাটে এসে নৌকো ভিড়েছে। একটু চেপে চুপে থাক—দেখো ঘাটের জলে নৌকোড়ুবি কোরো না—

কালিদাস—তার মানে—

অজামিল—বলছি মৌন থেকে মনে মনে বিবাহের মন্তর পড়বে। কথাটি বলবে না।

বটুকেশ্বর—আর একান্তই যদি কথা বলতে হয় একটু সামলে সুমলে নিয়ে বলবে।

করীন্দম—শুদ্ধ ভাষায় কথা কইবে।

কালিদাস—কি রকম ? শিখিয়ে দাও তবে দু' একটা।

করীন্দম—এই যেমন ধরো--(একটি ঢিল হাতে লইয়া) বলতো এটা কি ?

কালিদাস—ঢিল।

করীন্দম—শুদ্ধ ভাষায় একে বলে লোষ্ট্র।

কালিদাস—লোট্ ট—

করীন্দম—লোট্ ট নয়—বল লোষ্ট্র।

কালিদাস—লোষ্ট—

করীন্দম—না লোষ্ট নয়। তোমার দেখছি 'রফলার' দোষ রয়েছে। বল লোষ-ট্র।

কালিদাস—লোষ-ট্র—

করীন্দম—হুঁ লোষ্ট্র। এই তো হয়েছে। মনে থাকবে তো ? রফলা বাদ দিও না।

কালিদাস—আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। লোষ-ট্র লোষ-ট্র। 'র'ফলা ভুলব না। আমি খুব শ্রুদ্ধ্র ভ্রাষায় ব্রাক্যালাপ করব।

বটুকেশ্বর—বাঃ বাঃ, প্রভুর ওষ্ঠে যেন সরস্বতী বসেছেন—

কালিদাস—হ্যাঁ আমার ওষ্ট্রে স্রস্বতী।

করীন্দম—এই মরেছে! বিয়ের আগে রাজকন্যা এ বিদ্যা জানতে পারলে তো বিয়ের বাসরেই আমাদের আদ্যশ্রাদ্ধ হবে! ও কালিদাস, অত রফলা দিও না।

বটুকেশ্বর—অত রফলা দিলে গলায় মালা না দিয়ে গলাটি কেটে দেবে যে—

কালিদাস—কি করব তবে ?

করীন্দম—তুমি কথা কোয়ো না। আর একান্ত যদি কথা কইতে হয়, তাহলে ওষ্ঠ্র থেকে রফলাটিকে নামিয়ে দিয়ে শুধু ওষ্ঠেই কথা বোলো—

কালিদাস—শুধু ওষ্ঠ !

করীন্দম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো বিবাহ সভায়। মনে থাকে যেন রফলা বাদ দিয়ে চলবে, নইলে গলা কাটবে।

কালিদাস—ও বাবা, তবে রফলা থাক্—গলাকাটা যাওয়ার চেয়ে রফলা কাটা পড়ুক—সে অনেক ভালো

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

(দেবমিত্রের প্রাসাদকক্ষ। রাত্রিকাল।)

॥ দেবমিত্র ও বধূবেশে সত্যবতী ॥

দেবমিত্র—একি সত্যবতী—এ সময়ে তুমি বাসরঘর ছেড়ে, এখানে চলে এলে কেন ?

সত্যবতী—আমার কিছু কথা আছে পিতা—

দেবমিত্র—না, না, যে কোন কথাই হোক, যত প্রয়োজনীয় কথা হোক্—সে আজ নয়—কাল শুনব। বিবাহের রাত্রে নববধূর বাসরঘর ছেড়ে চলে আসা শাস্ত্রসম্মত নয়—এ কথা কি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে সত্যবতী ?

সত্যবতী—কিন্তু আমি যে কিছুতেই মনস্থির করতে পারছি না। জানি না, কি এক অজানা ভয়ে আমার বুক থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

দেবমিত্র—ছিঃ মা, শুভরাত্রিতে একি অমঙ্গল কথা তোমার মুখে? কিসের ভয় তোমার?

সত্যবতী—বাবা, উনি কথা বলেন না কেন?

দেবমিত্র—ওঃ, এইজন্য এত আশঙ্কা তোমার? (হাসিয়া) তুমি তো শুনেছো মা, উনি মৌনব্রতী। তাই তো বিবাহের মন্ত্র মনে মনে পাঠ করলেন।

সত্যবতী—মনে মনে উনি যখন মন্ত্র পাঠ করেন, আমি অবগুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করে দেখেছি বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে ওঁর ঠোঁট দুটো যেন ঠিক সমতালে নড়ছিল না, কেমন যেন—

দেবমিত্র—তুই পাগল হয়েছিস সত্যবতী! ঠোঁট নাড়া দেখে উচ্চারণ শুদ্ধ কি অশুদ্ধ হচ্ছে, তাই বুঝতে পারে কখনো অবগুণ্ঠিতা নববধূ বিবাহ সভায় বসে? তোর একি অদ্ভুত সন্দেহ! অতবড় মহাপণ্ডিত, যিনি তোকে পর্যন্ত তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিলেন—তাঁর উচ্চারণ হবে অশুদ্ধ!

সত্যবতী—পিতা—

দেবমিত্র—নিশ্চিন্ত হয়ে বাসরঘরে যা মা। স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ। ওই দেখ পুরাঙ্গনারা মঙ্গলপ্রদীপ নিয়ে বাসর-ঘরের দুয়ারে প্রতীক্ষা

করছেন। বোধ হয় এখনও ওদের স্ত্রীআচার কিছু বাকী আছে। যা, বাসর-ঘরে যা।

সত্যবতী—কিন্তু বাবা—

দেবমিত্র—না, আমি আর কোন কথা শুনব না। যা, বাসর-ঘরে যা।

(সত্যবতীকে বাসর-ঘরের দিকে পাঠাইয়া অন্যদিকে প্রস্থান করিতেছিলেন। সহসা অজামিল, বটুকেশ্বর ও করীন্দমের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাড়াইলেন।)

অজামিল, বটুক ও করীন্দম—(নেপথ্যে) জয়তু মহারাজাধিরাজ দাতৃশ্রেষ্ঠ নৃপতি দেবমিত্র। জয়তু—

দেবমিত্র—আসুন, আসুন ব্রাহ্মণ! কেমন, ভোজনাদি সমাপ্ত হয়েছে?

অজামিল—হ্যাঁ, তা হয়েছে। ঐ কর্মটি অসমাপ্ত রেখে মহারাজের জয় কামনা করতে আসব, তেমন মূর্খ আমরা নই।

দেবমিত্র—বেশ, বেশ, ভোজ্যবস্তু রসনাতৃপ্তিকর হয়েছে তো?

করীন্দম—রসনা-তৃপ্তিকর হয়েছে বটে! তবে উদরদেবতাকে নিয়ে আমরা কিছু বিব্রত বোধ করছি।

দেবমিত্র—(মৃদু হাসিয়া) আর দানের বস্তু যা পেয়েছেন আশা করি তা আপনাদের মর্যাদা অনুযায়ী হয়েছে—

অজামিল—হ্যাঁ, তা হয়েছে। তা হয়েছে। পট্টবস্ত্র, স্বর্ণভৃঙ্গার, গৃহিণীর জন্য কুন্তল, স্বর্ণকাঞ্চী—

বটুক—মায় রন্ধনশালার তৈজসপত্র—মহারাজ যা-যা দান করেছেন, সবই আমরা স্বস্তি বলে গ্রহণ করেছি।

অজামিল—এবং গো-শকটে করে গৃহাভিমুখে তদ্দণ্ডেই প্রেরণ করেছি।

বটুক—মহারাজের সকল দানবস্তুই বেশ ভারী এবং কথ্য ভাষায় যাকে বলে নিরেট—কি বল করীন্দম?

করীন্দম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বলতে পার—শুধু নিরেট। বিকটরূপে নিরেট। আর হবে না কেন? মহারাজকে আমরা যেরূপ দুর্লভ জামাই জুটিয়ে দিয়েছি—তারও তো তুলনা হয় না। তিনিও তো কথ্য ভাষায় একটি আস্ত নিরেট।

দেবমিত্র—আস্ত নিরেট! তার মানে—

অজামিল—মানে বুঝলেন না? আস্ত নিরেট পণ্ডিত।

বটুক—মানে পাণ্ডিত্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

করীন্দম—অর্থাৎ কিনা—ওঁর মাথাটি ফাঁপা নয়, একেবারে ছেঁচা পাথর দিয়ে তৈরী। জ্ঞান বুদ্ধি টন্‌টন্‌ করছে।

দেবমিত্র—আপনাদের কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি না! আচ্ছা, উনি কতদিন ধরে মৌন হয়ে থাকবেন?

করীন্দম—আমাদের সঙ্গে তো শর্ত ছিল যে কার্যসিদ্ধি হবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৌন থাকবেন।

বটুক—তবে বাসর-ঘরে ঢুকেছেন, এখন যে কতক্ষণ মৌন থাকবেন—

অজামিল—সেটা আমাদের ইচ্ছার চেয়ে, আপনার কন্যার ইচ্ছার ওপরেই অধিক নির্ভরশীল।

করীন্দম—কারণ এখন উনি আমাদের কবলমুক্ত হয়ে আপনার কন্যার কবলিত। তবে আপনার কন্যাকে সতর্ক করে দেবেন মহারাজ,—ওঁর মৌনব্রত ভঙ্গ না করলেই ভাল হয়।

দেবমিত্র—কেন বলুন তো—

করীন্দম—প্রভুর নিরুদ্ধ বাক্য একবার যদি গতিশীল হয়—তাহলে 'র' ফলার আকস্মিক আক্রমণে শত্রুমিত্র সকলেই বিপন্ন হয়ে পড়বেন।

দেবমিত্র—ঠিক বুঝতে পারছি না—যা বলতে চান আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।

বটুক—অধিক স্পস্ট হবার দুঃসাহস নেই মহারাজ। আমরা এবার বিদায় নিতে ইচ্ছা করি।

দেবমিত্র—কিন্তু কি আপনারা বলতে চাইছেন—তাতো বুঝতে পারলুম না।

অজামিল—কি করব। আপনি বুঝতে না পারলেও আমরা বুঝতে পারছি যে—আমাদের সমুহ বিপদ উপস্থিত।

দেবমিত্র—আঃ, কি বিপদ তাই বলুন না—

করীন্দম—আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান? তাহলে শুনুন মহারাজ—জঠরের স্ফীতি রোধের জন্য এই যে কঠোর বন্ধন দিয়েছি—এতে জঠর দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করে বলছেন—আমাকে বন্ধন মুক্ত কর।

অজামিল—নতুবা পিত্তলের গাড়ু দেবতাকে নিয়ে—

বটুক—মাঠের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হ।

[তিনজনেরই প্রস্থান

দেবমিত্র—ব্রাহ্মণ, শুনুন, শুনুন।···চলে গেল! এদের কথাবার্তা, চালচলন—কিছুই যেন আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। সত্যিই কি এরা আমার সঙ্গে কোনরকম প্রবঞ্চনা করেছে?···একি! বাসর-ঘরের দিকে কোলাহল কিসের? কি আশ্চর্য! সত্যবতী ও কালিদাস বাসর-ঘর ছেড়ে এই দিকেই আসছে যে? কি হল?···যাই অন্তরালে যাই—।

(দেবমিত্রের প্রস্থান। অপরদিক হইতে কালিদাস ও সত্যবতীর প্রবেশ)

কালিদাস—বা রে, যা বলবার সে তো আমি বলেই দিলুম। কতবার করে বলব!

সত্যবতী—কি বলেছ তুমি?

কালিদাস—তুমি শুধোলে, "কি ডাকছে?" আমি তো বললুম, "উট্ ডাকছে।"—শুনতে পাওনি? কানে একটু খাটো আছ বুঝি?

সত্যবতী- হ্যাঁ, আমার কান তোমার মত অতি দীর্ঘ নয়। আমি জানতে চাই—উটকে সাধুভাষায় কি বলে?

কালিদাস—তাও জান না? উটকে আমরা, সাধুরা বলি—'উট্র'।

সত্যবতী—কি, কি বললে?

কালিদাস—'উট্র'—'উট্র'—

সত্যবতী—'উট্র'! এই তোমার পাণ্ডিত্য! শব্দের উচ্চারণটুকুও জান না?

কালিদাস—ওঃ, ভুল হয়ে গেল বুঝি ? চটে গেলে আমার কি রকম যেন 'র' ফলার কেলেঙ্কারি হয়। এবার মনে পড়েছে উট্র নয়—আমি বলতে চেয়েছিলুম—'উষ্ট'—

সত্যবতী—'উষ্ট' !

কালিদাস—হ্যাঁ, 'উষ্ট'—'উষ্ট'—!

সত্যবতী—ছিঃ, ছিঃ—তুমি চুপ কর মূর্খ !

উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা যম্বা
তস্মৈ দত্ত্বা বিপুল নিতম্বা।

উষ্ট্র উচ্চারণ করতে গিয়ে যে একবার 'র' কার ও একবার 'ষ' কারের লোপ করে তার সঙ্গে হল আমার বিবাহ !

কালিদাস—তা তো হলোই। যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরবে না।

সত্যবতী—কি হয়ে গেছে ?

কালিদাস—কেন, আমাদের বিয়ে হল—

সত্যবতী—না, সে বিবাহ আমি অস্বীকার করি।

কালিদাস—বাঃ রে, সাতপাকে বেঁধে ফেললুম তোমায় ! সেই বিয়ে তুমি 'না' বললেই না হয়ে যাবে ?

সত্যবতী—হ্যাঁ, যাবে। কিসের বিবাহ ? আগাগোড়া তোমাদের ধাপ্পাবাজি, তোমরা নীচ, তোমরা প্রতারক—

কালিদাস—কিন্তু তবু—

সত্যবতী—কোন কথা শুনতে চাই না আর। আমাদের বিবাহ হয়নি, হয়েছে ছেলেখেলা। খেলা ভেঙে গেছে, যাও এবার দূর হও এখান থেকে।

কালিদাস—যাবো! বেশ যাচ্ছি। তবে দাঁড়াও, আমি আবার সাতবার ঘুরে নিই—!

সত্যবতী—কেন ?

কালিদাস—জানো না, লাটাইএ জড়ানো সূতো খুলতে হলে উল্টোপাক দিয়ে খুলতে হয়। তুমি ছুঁড়ী হয়ে আমাকে তোমার ঘুড়ী করে খেলতে চেয়েছো। এখন বলছো, "খেলবো না"। তাই লাটাই থেকে উল্টো সাতপাক দিয়ে সূতো খুলে নিয়ে যাই। এই—এক—

(কালিদাস ঘুরিতেছিল, সত্যবতী বাধা দিল)

সত্যবতী—থামো, বর্বর।

কালিদাস—বরবর। ওঃ, আমি তোমার বর। তাই আদর করে বারবার 'বর বর' বলছো, তাই না ? তবে সূতো খুলবো না। যাই এবার একছুটে আমি বাসর-ঘরে চলে যাই।

সত্যবতী—না, দাঁড়াও। আর বাসর-ঘরে নয়। তুমি এ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও। এখনই, এই মুহূর্তে।

কালিদাস—কোথায় যাবো ?

সত্যবতী—যে নরকে তোমার ইচ্ছা—।

কালিদাস—নরক। নরকে তো সবাই যায়—মরে যাবার পর। আমি তো এখনো মরিনি। আমি মলে তুমি তখন বিধবা হবে।

সত্যবতী—তোমার মত হস্তীমূর্খ স্বামীকে বহন করে জীবন-ভোর চোখের জল ফেলার চেয়ে বৈধব্যের যাতনাও আমি হাসতে হাসতে সহ্য করতে পারি।

(কালিদাস হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। দেবমিত্র ছুটিয়া প্রবেশ করেন।)

দেবমিত্র—সত্যবতী ! সত্যবতী ! এ তুই কি বললি মা !

সত্যবতী—বাবা ঐ নীচ, ঐ ভণ্ড, ঐ প্রতারক—রাজঐশ্বর্যের লোভে তোমাকে ছলনা করেছে। আমাকে ছলনা করে, আমার সর্বনাশ করতে এসেছে। ওকে দূর করে দাও—এখান থেকে দূর করে দাও।

[প্রস্থান

দেবমিত্র—সত্যবতী !

কালিদাস—মহারাজ, উনি ঠিক কথাই বলেছেন, আমি পণ্ডিত নই। বোকা, খুব বোকা। আপনাদের ঠকিয়েছি আমি। তবে এ ঠকাবার বুদ্ধিও আমার নয়, আপনাদের মত পণ্ডিতরাই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

দেবমিত্র—কালিদাস—!

কালিদাস—যা হবার হয়ে গেছে। সেজন্য আপনারা আমায় মাফ করবেন। এবার আমি যাই !

দেবমিত্র—কোথায় যাবে তুমি ? এই প্রাসাদের ঐশ্বর্য সম্পদ সবকিছুতেই তোমার অধিকার রয়েছে।

কালিদাস—না !

দেবমিত্র—না ? কেন ?

কালিদাস—আমি রাজা নই, পণ্ডিত নই। আমি খুব বোকা আর খুব গরীব। তবু হাত-পা-ওয়ালা মানুষ—আস্ত জানোয়ার নই। মহারাজ, যার বউ নিজের মুখে

বলে—তুমি বেঁচে থাকার চেয়ে বিধবা হওয়াও অনেক সুখের ;—শ্বশুর-বাড়ীর রাজভোগ তাকে ছুঁতে নেই—এটুকু আমি বুঝতে পারি।

[প্রস্থান

দেবমিত্র—কালিদাস—কালিদাস !

তৃতীয় দৃশ্য

(সবস্বতী মন্দিব সংলগ্ন মহাবন। কাল ঃ প্রভাত।)

(কুসুমিকা ও লক্ষহীবাব পেবেশ)

কুসুমিকা—আসুন দেবী, রথেব চাকা যতক্ষণ না ঠিক হয়, আমরা এখানে একটু বিশ্রাম কবি।

লক্ষহীরা—কিন্তু বেশীক্ষণ তো বিশ্রাম করা চলবে না, বসন্ত-উৎসবেব আগেই আমাদেব উজ্জয়িনীতে ফিরতে হবে যে !

কুসুমিকা—বসন্ত-উৎসবের এখনো তো দেরী আছে। আগে যে জন্য উজ্জয়িনী থেকে বেরিয়েছেন সেই উৎসব শেষ হোক। নাগদত্তের প্রাসাদে দেশ-বিদেশের কত রাজা, কত রাজকুমার আপনার নাচ দেখবার জন্য বসে আছে যে !

লক্ষহীরা—তারা বসেই থাকুন—আমি সেখানে নাচবো না।

কুসুমিকা—নাচবেন না ? সে কি ?

লক্ষহীরা—না, পথে বাধা পড়েছে, আমি আজই উজ্জয়িনীতে ফিরে যাবো।

কুসুমিকা—ফিরে যাবেন? নাগদত্ত এত হীরা-মুক্তা যৌতুক পাঠাল, আপনার একটি নাচ দেখবার জন্য। পথের মাঝখানে এসে এখন আপনি বলছেন, নাচব না! ফিরে যাবো!

লক্ষহীরা—ওরকম হয় কুসুমিকা। তুই তো জানিস অনেক নাগদত্ত ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে, কিন্তু তবু—খেয়ালী লক্ষহীরা নাচেনি, তার ইচ্ছা না হলে সম্রাট বিক্রমাদিত্যও তাকে নাচাতে পারেন না।

কুসুমিকা - দেবী, তবে কি ফিরেই যাবেন?

লক্ষহীরা—হ্যাঁ তাই ভাবছি, পথের মাঝখানে রথের ঘোড়া ক্ষেপে গেল, রাস্তা ছেড়ে বনের মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা লেগে রথের চাকা চুরমার হয়ে গেল। সারথীর সাধ্য হল না ঘোড়াকে সংযত করে. ভয়ে প্রায় অচেতন হয়ে গেলাম, হয়তো মরেই যেতুম, যদি না সেই পথচারী নিজের জীবন বিপন্ন করে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরতো।

কুসুমিকা—সত্যিই, ভাবতেও ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

লক্ষহীরা—লোকটা আজ আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তাকে এখনও পুরস্কৃত করা হয়নি। কুসুমিকা, লোকটা কোথায়?

কুসুমিকা—সে লোকটা! তা তো বলতে পারি না দেবী। ওই যে সারথী মাল্যবান আসছে। ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

(মাল্যমানের প্রবেশ)

মাল্যবান—রথ প্রস্তুত দেবী, আপনারা রথে আরোহণ করবেন আসুন।

লক্ষহীরা—মাল্যবান, যে লোকটি ঘোড়ার রাশ ধরে আমাদের বাঁচিয়েছে সে কোথায়?

মাল্যবান—সে এতক্ষণ রথের নূতন চাকা লাগাতে আমাকে সাহায্য করছিল। কাজ শেষ হয়ে গেছে—ঐ তো সে চলে যাচ্ছে।

লক্ষহীরা—ডাকো, ওকে এখানে ডাকো।

মাল্যবান—ওহে শোন, শোন, মহাদেবী তোমাকে ডাকছেন।

(কালিদাসের প্রবেশ)

কালিদাস—আমাকে ডাকছেন?

লক্ষহীরা—হ্যাঁ, মাল্যবান তুমি রথে গিয়ে বোসো, আমরা এখুনি আসছি।

[মাল্যমানের প্রস্থান

তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে, আজ আমাদের রক্ষা করেছ—এই নাও তোমার পুরস্কার। (কণ্ঠহার খুলিলেন)

কালিদাস—ও আমি নেব না।

লক্ষহীরা—(অন্যহার খুলে) তবে এইটে—

কালিদাস—ও-ও না।

লক্ষহীরা—বুঝেছি তুমি চতুর। বেশ তবে এই নাও।

(সর্বাপেক্ষা সুন্দর মালা দেখাইল)

কুসুমিকা—দেবী ওই মালা—

লক্ষহীরা—চুপ কর কুসুমিকা—আমার জীবন বাঁচিয়েছে, তাই ওকে তার উপযুক্ত মূল্যই দিতে হবে। নাও—

কালিদাস—বলেছি তো আমি নেব না।

লক্ষহীরা—কেন ?

কালিদাস—আমার ধুলো-কাদা মাখা হাতে, অমন চক্‌চকে হার ময়লা হয়ে যাবে। ও তোমার গলাতেই ভালো মানিয়েছে, ওখানেই থাক ! আমি যাই—

লক্ষহীরা—দাঁড়াও—

কালিদাস—কি ?

লক্ষহীরা—রাজনটী লক্ষহীরার গলার হীরার মালা যে কেউ হাতে পেয়েও ফিরিয়ে দিতে চায় এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না। তুমি মূর্খ, তুমি জান না এ মালার কত দাম—

কালিদাস—নিজের জীবনটাকেই যে শেষ করে দিতে চায়, তার কাছে হীরার মালা, আর কাঁচের মালা, দুই-এর সমান দাম।

লক্ষহীরা—জীবনটাকে শেষ করবে ? কেন ?

কালিদাস—যে জীবনের কোন দাম নেই, তাকে রেখে কি হবে ?

লক্ষহীরা—কে বললে তোমার জীবনের দাম নেই ? আমি তোমায় কিনে নেব। যাবে আমার সঙ্গে ?

কালিদাস—কোথায় ?

লক্ষহীরা—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী।

যাবে সেখানে ? তার জন্যে যে কোন দাম চাও—আমি তাই দিতে প্রস্তুত।

কালিদাস—বেশ, যাবো, দাও আমায় দাম দাও—

লক্ষহীরা—বল কি চাই ?

কালিদাস—আমি চাই বিদ্যা, আমি চাই জ্ঞান।

লক্ষহীরা—বিদ্যা ! জ্ঞান !

কালিদাস—হ্যাঁ, যে সে বিদ্যা নয়, যাতে সারাজগতের মানুষ এই কালিদাসের কাছে মাথা নোয়ায়,—এমন জ্ঞান চাই আমি, চাই আমি এমন বিদ্যা। দিতে পার, দিতে পার তুমি ?

লক্ষহীরা—বিদ্যা ! নর্তকীর বিদ্যা হল নাচ, গান, ছলাকলা, রঙ্গকৌতুক। মানুষের মন ভোলাই, মানুষকে অচেতন করি, অজ্ঞান করি, জ্ঞান দিতে পারি না কালিদাস।

কালিদাস—তাহলে যাও, তুমি তোমার পথ দেখ, আমিও আমার পথ দেখি।

লক্ষহীরা—শোন, একটি অনুরোধ।

কালিদাস—কি ?

লক্ষহীরা—তুমি আমাব জীবন বাচিয়েছ, তোমার কাছে আমি ঋণী। সে ঋণ শোধ করবার নয়, তবে যদি কোন দিন আমাকে দিয়ে তোমার কোন প্রয়োজন হয়, আমার নাম লেখা এই আংটিটি রেখে দাও। এই আংটিটি যাকে দেখাবে সেই উজ্জয়িনীতে আমার কাছে তোমায় নিয়ে যাবে। নাও।

কালিদাস—বেশ, দিচ্ছ দাও।

[লক্ষহীরার আংটি পরাইয়া দিয়া কুসুমিকা সহ প্রস্থান

লক্ষহীরার আংটি। এ আংটি নিয়ে আমি কি করব? না, আমার কাউকে কোনো দরকার হবে না। আমি বোকা বলে বাসর-ঘর থেকে বউ অপমান করে তাড়িয়ে দিল। আমার মত স্বামীর বেঁচে থাকার চেয়ে বিধবা হওয়াও ভালো। না, এ জীবন রাখব না। ওই যে সামনে মরণ সায়র। কাল-কেউটে সাপ কিলবিল করছে। ওরই জলে ডুবে মরব।

[কালিদাসের প্রস্থান

(অজামিল, করীন্দম ও বটুকেশ্বরের প্রবেশ)

অজামিল—করীন্দম দেখ, ঐ দেখ—

করীন্দম—একি! কালিদাস!

বটুকেশ্বর—কালিদাস এখানে কেন? ওকি, কাল-সায়রে নামছে যে?

অজামিল—বোধ হয় বউ-এর তাড়া খেয়ে জলে ডুবে মরতে এসেছে।

বটুকেশ্বর—আহা, বেচারা আমাদের জন্যেই ম'ল।

করীন্দম—একি কাণ্ড!

অজামিল—কি?

বটুকেশ্বর—ঐ মরণসায়রের দিকে তাকাও।

অজামিল—কি আশ্চর্য! কালিদাস জলে নামলো আর মরণ-

সায়রের সব সাপ পদ্মের মৃণাল হয়ে গেল ! শ্যাওলা আর পানাগুলো হল পদ্মপাতা।

করীন্দম—ওই দেখ কালিদাস দুবার ডুব দিয়ে দুটো পদ্ম তুলল !

বটুকেশ্বর—একটা লালপদ্ম আর একটা সাদা-পদ্ম।

অজামিল—ঐ যে জল থেকে উঠে আসছে। সঙ্গে সরস্বতী মন্দিরের পুরুত। দেখ, দেখ, জল থেকে উঠল—অথচ কাপড় একটুও ভেজেনি। এমন শুকনো কাপড়ে উঠল কি করে ?

বটুকেশ্বর—একি কোন মায়া, কোন ভোজবাজী ?

করীন্দম—শোন শোন, একটা গানের স্বর ভেসে আসছে না !

অজামিল—তাইতো, কি একটা আশ্চর্য যন্ত্রসঙ্গীত চারিদিক থেকে ভেসে আসছে !

বটুকেশ্বর—এই নির্জন বনে কে এমন করে বাজায় ?

করীন্দম—এ নিশ্চয়ই কোনো ভুতুড়ে ব্যাপার ভাই ! আর এ বনে নয়, চলো দিই চোঁ চা দৌড়—

[সকলের প্রস্থান

(কালিদাস ও বাণীকণ্ঠের প্রবেশ)

বাণীকণ্ঠ—কালিদাস, কালিদাস, কথা কও, তোমার দৃষ্টিতে একি বিহ্বলতা ! সারা দেহে এ কিসের রোমাঞ্চ ! মনে হয়, তুমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ বনকুরঙ্গ !

কালিদাস—ঠিক বলেছ ব্রাহ্মণ, কে যেন তার অপরূপ সঙ্গীত মূর্ছনায় আমায় বিমুগ্ধ করে দিয়েছে। দেহের শিরা, উপশিরায় প্রতি রক্তবিন্দু মাঝে অনুভব করছি সেই

বিচিত্ররূপিণীর ছন্দ মাধুরী। নদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, বনভূমির পল্লব মর্মরে, আকাশের আলোকতন্ত্রীতে অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে, তাঁর অনুপম বীণার ঝঙ্কার। মন্ত্রমুগ্ধ কুরঙ্গের মত আমি তাঁরই অন্বেষণে ছুটতে চাই। কিন্তু কই, দেখা তো পাই না ব্রাহ্মণ। কোথায় কোথায় সেই জ্যোতির্ময়ী বীণাবাদিনী, কোথায় সেই ছন্দ সরস্বতী !

বাণীকণ্ঠ—তিনি তোমারই অন্তরে কালিদাস, তোমারই জিহ্বাগ্রে তিনি অধিষ্ঠিতা !

কালিদাস—আমারই অন্তরে ! আমারই জিহ্বাগ্রে !

বাণীকণ্ঠ—হ্যাঁ, বিদ্যা-বর প্রার্থনা করে তুমি আজ যে জলে স্নান করেছ, অজ্ঞ মানুষ ওকে মরণসায়র বললেও ওই সরোবরের নাম সারস্বত কুণ্ড ! ওই জলে স্নান করে তুমি বাগ্দেবীর আশীর্বাদ পেয়েছ। তিনি তোমাকেই আশ্রয় করেছেন। মৃগনাভি গন্ধমত্ত মৃগের মত তাই আপন অন্তরের ছন্দকে, তুমি আজ স্পন্দিত দেখছ, আকাশে বাতাসে। আদিম পৃথিবী তাই আজ তোমার চোখে নব-রূপে, নব-সাজে সুসজ্জিতা।

কালিদাস—আদিম পৃথিবী ? কে বলে পৃথিবীকে আদিম ? কে বলে তাকে পুরাতন ? সিন্ধুজল সমুত্থিতা শ্যামাঙ্গিনী বসুন্ধরা আজ রাজ-রাজেশ্বরী মূর্তিতে বিরাজিতা। ললাটে কুঙ্কুম চন্দনের পত্রলেখা, কর্ণাভরণ কাশ্মির কুসুম, শীর্ষে তুষার ধবলিত হিমাদ্রি মুকুট, পাদ-পীঠতলে সিংহলের সুবর্ণ কমল। আকাশের নীলকান্ত মণিময় চন্দ্রাতপ তলে

ধরণীর আজ আলোক-বন্যায় অভিষেক স্নান। বিশ্ব প্রকৃতির একি দিব্যরূপ দেখলুম! ধন্য আমার নয়ন, ধন্য আমার জীবন। সাধ যায় ছন্দোবদ্ধ মহাকাব্যে ধরণীর প্রশস্তি গাথা রচনা করি। বলতে পার—বলতে পার ব্রাহ্মণ! এ কাব্য সুরধনি কেমন করে প্রবাহিত হল আমার এই ঊষর মরুভূমির মত বিশুষ্ক হৃদয়ে?

বাণীকণ্ঠ—তাঁরই আশীর্বাদে কালিদাস, সেই বাগ্দেবীর আশীর্বাদে। তোমার হাতের ওই পদ্ম দুটি দিয়ে কি করবে কালিদাস?

কালিদাস—পদ্ম! এ পদ্ম তুলেছি সেই অলক্ষ্যচারিণী জ্যোতির্ময়ীর আদেশে। তিনি আমায় আদেশ করলেন, জলে ডুব দিয়ে যা পাবে তাই তুলে আন। প্রথমে উঠল 'পঙ্ক'। বললেন, আবার ডুব দাও—ডুব দিলুম, পেলুম এই কণ্টকিত মৃণাল পদ্ম। বললেন, আবার ডুব দাও—শেষবারে পেলুম এই অকণ্টক কুবলয়।

বাণীকণ্ঠ—তারপর—

কালিদাস—দেবীর আদেশে এই পুষ্প দুটি আহরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে জড় জিহ্বায় আমার বাগ্দেবীর করুণায় ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের জন্ম হল। নতজানু হয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলুম— পদ্মমিদং মম দক্ষিণ হস্তে

বামকরে লসদুৎপলমেকম্
ব্রুহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজ নেত্রে,
কর্কশ নালম্ বা কর্কশ নালন্?

পদ্ম এনেছি দক্ষিণ করে,
বাম করে কুবলয়,
পঙ্কজ নয়না, কহ,
কি নিতে ইচ্ছা হয়।
মৃণালে যাহার কণ্টক শোভে
চাহ তুমি সে কমল ?
অথবা লইবে কণ্টক ছায়া
এই চারু উৎপল।

বাণীকণ্ঠ—অপরূপ ছন্দ কালিদাস, তোমার বিরচিত এই প্রথম শ্লোকের বাণী বন্দনায়, তুমি বাগ্দেবীকে প্রসন্না করেছ। কিন্তু—

কালিদাস—কিন্তু কি ব্রাহ্মণ ?

বাণীকণ্ঠ—তুমি জননীকে 'পঙ্কজনেত্রা' বলে বর্ণনা করেছ। সর্ব প্রথমে আরাধ্যাদেবীর পাদপদ্মের বর্ণনা করাই ভক্তের কর্তব্য। কিন্তু তুমি চরণ বর্ণনা না করে, সামান্যা নায়িকার ন্যায় জননীর নয়নের তথা মুখসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছ।

কালিদাস—সত্যিই তো অজ্ঞানতা বশতঃ আমি মহাভ্রম করে ফেলেছি।

বাণীকণ্ঠ—তুমি জগৎবন্দিত মহাকবি হলেও এই ভ্রমের জন্য তোমার মৃত্যু হবে অগৌরবের।

কালিদাস—অগৌরবের ?

বাণীকণ্ঠ—হ্যা, জীবনান্ত হবে তোমার রূপগশারিণী কোনো নায়িকার হস্তে।

কালিদাস—ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

বাণীকণ্ঠ—তুমি দুঃখিত হয়ো না কালিদাস, অজ্ঞাতসারে যা করেছ তাকে নিয়তির বিধান বলে মেনে নাও।

কালিদাস—তাই নেব ব্রাহ্মণ। নিয়তির বিধান বলেই মেনে নেব। এই নাও, এই পদ্ম দুটি তুমি আমার হয়ে মাতৃপদে নিবেদন কোরো। বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদের সঙ্গে পেলাম তাঁর অভিশাপ। সেই অভিশাপ আর আশীর্বাদ কবি কালিদাসের জীবনস্রোতে এক সঙ্গে প্রস্ফুটিত হোক, দুটি শতদলের মত।

চতুর্থ দৃশ্য

(রাজা দেবমিত্রের প্রাসাদ কক্ষ।)

॥ দেবমিত্র ও সত্যবতী ॥

দেবমিত্র—দেশে দেশে গুপ্তচর প্রেরণ করলাম, ঘোষণা করলাম, যে কালিদাসকে ফিরিয়ে আনতে পারবে তাকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব। কিন্তু এখনো কেউ তার সন্ধান নিয়ে আসতে পারল না।

সত্যবতী—কোনো প্রয়োজন ছিল না তোমার এই পুরস্কার ঘোষণার। কেন, কেন, তুমি তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য এত চেষ্টা করছ?

দেবমিত্র—তুই বলিস কি সত্যবতী! বিবাহের রাত্রে নব-পরিণীতা পত্নীকে ছেড়ে, অতুল রাজঐশ্বর্য ছেড়ে, একবস্ত্রে

যে চলে গেল, কি নিদারুণ অভিমান নিয়ে সে চলে গেল, সেকি আমি বুঝতে পারি না? তাকে আমন্ত্রণ করে না আনলে সে কি এ প্রাসাদে আর কখনো ফিরবে মনে করিস?

সত্যবতী—নিশ্চয়ই ফিরবে, দরিদ্র ভিখারী, হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেছে, তার ক্রোধ প্রশমিত হতে বিলম্ব হবে না, রাজপ্রাসাদের স্বুবর্ণ মায়ায় সে আবার ফিরে আসবে এখানে—

দেবমিত্র—ভগবান করুন, তোর অনুমান সত্য হোক—সে ফিরে আস্থক। ওরে, অগ্নিসাক্ষী করে তার হাতে তোকে সম্প্রদান করেছি, সে যদি না আসে তোর জীবন যে ব্যর্থ; ব্যর্থ হবে তোর বিদ্যা, তোর শাস্ত্রচর্চা।

কালিদাস—(নেপথ্য লইতে) সত্যবতী—সত্যবতী—!

দেবমিত্র—একি! কে তোর নাম ধরে ডাকে? কি বিচিত্র, মনে হচ্ছে কালিদাসের কণ্ঠস্বর! ওরে, সামনের দরজাটা খুলে দে।

সত্যবতী—এত অপমানের পর—এত শীঘ্র ফিরে এলো, তবে কি—

দেবমিত্র—আর কোনো কথা নয় মা, আর কোনো কুণ্ঠা নয়। যা, ওকে আবাহন করে আন।

[প্রস্থান

কালিদাস—(নেপথ্যে) সত্যবতী, দ্বারমুদ্‌ঘাটং দীয়তাম্।

সত্যবতী—দ্বারমুদ্‌ঘাটং দীযতাম্। একি! এমন বিশুদ্ধ দেব-

ভাষায় কথা বলছে মহামুর্খ, যে উষ্ট্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না! একি বিচিত্র রহস্য! দেখি, দ্বার খুলে দিয়ে দেখি—

(দরজা খুলিয়া দিল। কালিদাসের প্রবেশ)

কালিদাস—সত্যবতী—

সত্যবতী—কিমত্র প্রয়োজনম্? এখানে কি প্রয়োজন?

কালিদাস—অস্তি কশ্চিৎ বাগ্ বিশেষ।

সত্যবতী—অস্তি কশ্চিৎ বাগ্ বিশেষ! যা উচ্চারণ করলে তার অর্থ জান তুমি?

কালিদাস—জানি সত্যবতী, আমি বললুম, কিছু কথা আছে আমার।

সত্যবতী—হুঁ, চমৎকার। এবার নূতন ছলনা শিখে এসেছ। কোনো প্রবঞ্চকের কাছে দেব ভাষায় দুটি ছত্র কণ্ঠস্থ করে এসেছো, তাই না?

কালিদাস—শুধু দুটি ছত্র নয় সত্যবতী, দেবভাষার অনাদি-অনন্ত ভাণ্ডার আজ আমার কণ্ঠে। বাগ্দেবী সরস্বতী, আজ অধিষ্ঠান করছেন, এই কালিদাসের জিহ্বাগ্রে। প্রবঞ্চকের কাছে দেবভাষা শিখে এসেছি! আমি প্রবঞ্চক! হ্যাঁ, তোমার উপাস্যা দেবীর ধর্ম যদি প্রবঞ্চনা হয়—তাহলে স্বীকার করছি আমিও প্রবঞ্চক।

সত্যবতী—কিন্তু কি করে বুঝবো যে, আজও তুমি প্রবঞ্চনা করতে আসনি! বল—উত্তর দাও।

কালিদাস—এ কথার আমি কোনো উত্তর দেব না সত্যবতী।

ভাবীকালে, আমারই রচিত মহাকাব্য এর উত্তর বহন করে আনবে।

সত্যবতী—তোমার রচিত মহাকাব্য ?

কালিদাস—হ্যাঁ, বিস্মিত হয়ো না, এই মহামূর্খ কালিদাস রচিত মহাকাব্যের প্রথম ছত্রেই পাবে এ প্রশ্নের উত্তর। অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌ বিশেষ—আমার উচ্চারিত দেবভাষার এই ছত্রে তুমি ছলনা খুঁজে পেয়েছ। এই ছত্রের প্রতিটি বাক্য দিয়ে আমি এক একখানি মহাকাব্য রচনা করব। 'অস্তি' বাক্য দিয়ে আরম্ভ হবে "কুমার সম্ভব" প্রথম ছত্র তার "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধি-রাজঃ।" 'কশ্চিৎ' দিয়ে "মেঘদূত"—"কশ্চিৎ কান্তাবিরহ-গুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তাঃ।" 'বাগ্‌' এই বাক্য দিয়ে "রঘুবংশ"—"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ।" সরস্বতীর আশীর্বাদ লাভের পর তোমাকে আমার প্রথম সম্ভাষণের বাক্যচয় দিয়ে যে দিন নানা মহাকাব্য রচনা করব, সেইদিন বুঝতে পারবে সত্যবতী, আমার দম্ভ আর তোমার দম্ভের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে আকাশ আর পাতাল। আজ যাই তবে।

(দেবমিত্রের প্রবেশ)

দেবমিত্র—না, না কালিদাস, আমি তোমাকে যেতে দেব না। সত্যবতীর হয়ে আমি তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি। এই প্রাসাদে থাক তুমি। এখানে থেকে বাগেদবীর সাধনা কর।

কালিদাস—ক্ষমা করবেন মহারাজ। লক্ষ্মী সরস্বতীতে চির বিবাদ একথা লোক-প্রসিদ্ধ। সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার যাকে মুগ্ধ করে, লক্ষ্মীর নূপুর নিক্কন তাকে আর ভোলাতে পারে না। আমি যাই মহারাজ।

দেবমিত্র—সত্যবতী, যদি পারিস্ এখনো চেষ্টা করে দেখ মা—

[প্রস্থান

কালিদাস—বিদায় বেলায় এমন স্তব্ধ, মৌন হয়ে থাকবে? একটি কথাও বলবে না?

সত্যবতী—তুমি—তুমি সত্যই যাবে?

কালিদাস—হ্যাঁ যাবো।

সত্যবতী—কোথায়?

কালিদাস—নির্জন নির্বাসনের দিনগুলি ভরে তুলতে আমার কাব্যমঞ্জুষা দিয়ে। কি, নীরব হয়ে কি ভাবছ? তোমার আঁখি কোণে অভিমানের কাজললেখা, সে অভিমান আঁখি-পল্লবের ঝলমল মুক্তাবিন্দুগুলিকে কিন্তু লুকোতে পারেনি। লজ্জিতা হয়ো না, মুখ ফিরিয়ে নিও না। আমি যাই, তবে যাবার বেলায় বলে যাই—আবার দেখা হবে। দেখা হবে সেইদিন, যেদিন কাব্যসরস্বতীর আদেশ পালন করতে পারবো—

সত্যবতী—বেশ আমিও বলছি, সত্যিই যদি কাব্য রচনা সমাপ্ত করতে পার, সে দিন তুমি ফিরে এসো। পরম আগ্রহে সেই দিনের প্রতীক্ষা করব আমি, যেদিন তোমার রচিত সার্থক কাব্য নিয়ে তুমি আমার কাছে আসবে।

কালিদাস—এবারও ভুল বললে সত্যবতী। আমি আর আসব না তোমার কাছে। সময় হলে তুমিই যাবে আমার কাছে। সারা বিশ্বের কাব্য-রসিক সমাজ, অনন্ত পিপাসা নিয়ে বসে আছে কালিদাসের কাব্যসুধা আস্বাদনের আশায়। বিশ্বপ্রকৃতির আলোকরশ্মি নিয়ে রচিত হবে, অনন্ত নীলাকাশতলে বিচিত্র স্বর্ণ মৃণাল, আর সেই মৃণাল তন্তুর ওপর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে, কালিদাসের বিমথিত হৃদয়ের ভাব-সম্পদরূপী স্বর্গীয় কমল। কমল যখন প্রস্ফুটিত হয়, মধুগন্ধ প্রমত্ত ভ্রমর, দলে দলে ছুটে আসে তার কাছে মকরন্দ লোভে। ভ্রমর-ভ্রমরীই পদ্মের কাছে আসে সত্যবতী, পদ্ম ভ্রমর ভ্রমরীর পিছনে ছোটে না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(উজ্জয়িনীতে লক্ষহীরার প্রাসাদ কক্ষ।)

॥ ভোজরাজ নাগদত্ত ও শূরসেন। নাগদত্ত চঞ্চল ভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন ॥

নাগদত্ত—আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছি অথচ তার সাক্ষাৎ করবার অবকাশ হল না! একটা রূপোপজীবিনীর এত স্পর্ধা যে ভোজরাজ নাগদত্তকে এ ভাবে উপেক্ষা করে।

শূরসেন—ভারতসম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভার রাজনর্তকী। বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহ লাভ করে নর্তকীর স্পর্ধা আকাশ-স্পর্শী হয়ে উঠেছে। চলুন মহারাজ, আর অপেক্ষা না করে আমরা বরং ভোজরাজ্যে ফিরে যাই।

নাগদত্ত—তুমি কি বলছ শূরসেন! ফিরে যাবো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে? আমার কাছে সে নাচবার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছে অথচ নাচতে যায়নি। কেন তার এ ঔদ্ধত্য, তাকে আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তার উত্তর না শুনে আমি কিছুতেই ফিরবো না।

শূরসেন—ঐ যে তার সহচরী এই দিকেই আসছে। শুনুন কি বলে।

(কুসুমিকার প্রবেশ)

কুসুমিকা—ভোজরাজ নাগদত্ত জয়তু।

নাগদত্ত—থাম। আমার জয়ধ্বনি শোনবার আগে আমি জানতে চাই লক্ষহীরা এখনো কেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে না!

কুসুমিকা—কাল সারারাত বসন্ত-উৎসবের নাচ গান হয়েছে। তাই দেবী লক্ষহীরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

নাগদত্ত—তাঁকে আমার আগমন সংবাদ তোমরা কেউ জানাওনি?

কুসুমিকা—ঘুমন্ত মানুষের সঙ্গে কি কথা বলা যায়?

নাগদত্ত—তাঁর ঘুম ভাঙ্গাওনি কেন?

কুসুমিকা—তিনি নিজে না জাগলে তাঁর ঘুম ভাঙ্গাবার আদেশ আমাদের কারো উপর নেই।

শূরসেন—কিন্তু স্বয়ং ভোজরাজ নাগদত্তের উপস্থিতিতেও কি এই নিয়ম চলবে?

কুসুমিকা—ভোজরাজের মত শতশত নৃপতি যাঁর কাছে মাথা নত করেন ভারতের সেই একচ্ছত্র সম্রাট স্বয়ং বিক্রমাদিত্য এলেও ঘুমন্ত লক্ষহীরার ঘুম ভাঙ্গানো চলে না।

নাগদত্ত—হুঁ, এখনো তিনি ঘুমুচ্ছেন?

কুসুমিকা—না, শয্যাত্যাগ করেছেন।

নাগদত্ত—এইবার তাঁকে আমার আগমন সংবাদ জানানো হয়েছে?

কুসুমিকা—হয়েছে মহারাজ।

নাগদত্ত—তিনি তা হলে এখনো আসছেন না কেন? কি করছেন ঘুম থেকে উঠে—

কুসুমিকা—প্রাসাদপিঞ্জরে আবদ্ধ বানর-দম্পতিকে মহাদেবী পক্ক কদলী ভোজন করাচ্ছেন। সম্ভবতঃ বানরের কদলী-ভক্ষণ সাঙ্গ হলেই দেবী আপনাদের দর্শন দেবেন। ওই যে, বলতে না বলতেই দেবী এই দিকে আসছেন। তাহলে আমার অনুমান সত্য, বানর সম্বর্ধনার পরেই—

(লক্ষহীরার প্রবেশ)

লক্ষহীরা—ভোজরাজ সম্বর্ধনার মানসে বিনীতা লক্ষহীরা তাঁর সামনে সমুপস্থিত। কুসুমিকা, বানর দুটি কলা খেয়েছে, কিন্তু মনে হল তেমন সন্তুষ্ট মনে খায়নি। তুই যা এবার তাদের তত্ত্বাবধান করগে। আমি এই সম্মানিত অতিথিদের তত্ত্বাবধান করছি।

[কুসুমিকার প্রস্থান

একি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন আপনারা? আসন গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

নাগদত্ত—থাক্ আর সম্বর্ধনা করতে হবে না। আমরা তোমার সম্বর্ধনা লাভের জন্য আসিনি···এসেছি তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে—

লক্ষহীরা—শুধুই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা? আর কিছু না? ভোজরাজের জিজ্ঞাস্য যা তা দূতের হাতে লিপি প্রেরণ করলেই হতো। শুনেছি ভোজরাজ শ্রুতিধর, মহাপণ্ডিত। একখানি লিপিকা রচনা করতে যে পরিশ্রম তার চেয়ে লক্ষগুণ

ক্লেশ স্বীকার করে ভোজরাজ্য ছেড়ে উজ্জয়িনীতে আসার তো কোনোই প্রয়োজন ছিল না। পত্র পেলে বরং তার মধ্যে কিছু প্রণয়-সম্ভাষণ পেতুম। প্রিয়তমাসু, প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি অনেক মধুমাখা বাক্যের অবতারণা থাকত। কিন্তু বর্তমানে মহারাজের কাছে যা পাচ্ছি—তাকে আর যাই বলা যাক না কেন, অন্ততঃ প্রণয়-সম্ভাষণ বলা যায় না।

নাগদত্ত—না, তোমার মত একটি বহুবল্লভা রূপপশারিণীকে প্রণয়-সম্ভাষণ করতে আমি এতদূর পথ আসিনি। তোমাকে প্রণয়-সম্ভাষণ করতে আমার লজ্জা হয়।

লক্ষহীরা—লজ্জা রমণীর ভূষণ, পুরুষের ভূষণ পৌরুষ। মহাপণ্ডিত ভোজরাজকে কি একটি সামান্যা রূপপশারিণীকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ?

নাগদত্ত—লক্ষহীরা—

লক্ষহীরা—আমি বহুবল্লভা, হ্যাঁ বহুজনের প্রীতির জন্য আমি এ দেহকে বিক্রয় করি। লজ্জা বহুবল্লভার নয়—মাথা হেঁট হওয়া উচিত তাদের যারা বহুবল্লভা জেনেও সেই উচ্ছিষ্টা নারীর দেহকে নিয়ে মাংসলোভী পথের কুকুরের মত ছিনিমিনি খেলতে চায়। লজ্জা, ঘৃণা, কৃপার পাত্র, সেই সব পণ্ডিতরূপী সারমেয়।

নাগদত্ত—লক্ষহীরা, লক্ষহীরা, তোমার কাছে আমি হিতোপদেশের শ্লোক শিক্ষা করতে আসিনি। আমি জানতে এসেছি আমার রাজসভায় নাচবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি কেন নাচতে যাওনি ?

লক্ষহীরা—কি করবো, আমি তো যেতে চেয়েছিলুম। কিন্তু পথের মধ্যে আমার রথ বিগড়ে গেল।

নাগদত্ত—রথ বিগড়ে গেল ?

লক্ষহীরা—হ্যাঁ, ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনপথে ছুটল। রথের চাকা ভেঙ্গে গেল। দুর্লক্ষণ মনে করে আমি ফিরে এলুম উজ্জয়িনীতে।

নাগদত্ত—রথের চাকা যখন মেরামত করা হল, তখন গেলে না কেন ?

লক্ষহীরা—কি করব ! দুলক্ষণ দেখলুম যে—

নাগদত্ত—দুর্লক্ষণ ?

লক্ষহীরা—নয় ? আমি তো যাচ্ছিলুম, কিন্তু শুনেছি, জন্তুরা জন্তুর স্বভাব বুঝতে পারে। তাই আমার রথের ঘোড়া চাটি মেরে রথের চাকা ভেঙ্গে দিয়ে আমায় জানাল—'যেয়ো না। অরসিককে রস নিবেদন করতে গিয়ে নিজেই ব্যথিতা হোয়ো না।'

নাগদত্ত—হুঁ, তাহলে তোমার কাছে ভারতের একমাত্র রসিক-পুরুষ সম্রাট বিক্রমাদিত্য ?

লক্ষহীরা—রাজা, মহারাজা বা সম্রাট জানি না, রসবস্তুর বিচার করে রসিক-হৃদয়। সে রসিক-হৃদয়ের সন্ধান, কই, আজও তো পেলুম না ! সারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠা নর্তকী-রূপে পূজো পাচ্ছি, স্তুতিগানে আমার পাদপীঠতলে মাথা নত করে কত রাজা, মহারাজা, এমন কি স্বয়ং ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। তবু রস-বস্তুর সন্ধান পেলুম না—পেলুম

না দেখা এমন কোন রসবেত্তার যে আমার দেহ-সুরধুনীর দুকূল প্লাবী তরঙ্গে ভেসে যায় না। গঙ্গাধরের মত যে এই সুরতরঙ্গকে ত্রিজটার বাঁধনে আটকে দিয়ে বলে "তিষ্ঠ, স্থির হও, শোনাও আমাকে কল-কল্লোল।" কোন দিন, কোন অনাগত লগ্নে সে কি আসবে না! আসবে না সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ গঙ্গাধর?

(কালিদাসের প্রবেশ)

কালিদাস—আমি এসেছি।

লক্ষহীরা—কে! তুমি! তুমি এখানে?

কালিদাস—তোমারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় সাহায্যে এসেছি।

লক্ষহীরা—এ আমার স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য। তুমি যে সত্যিই আবার আসবে এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এসো বন্ধু, আসন গ্রহণ কর।

কালিদাস—কিন্তু এঁরা সবাই দাঁড়িয়ে?

লক্ষহীরা—ওঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেই অভ্যস্ত। প্রাসাদে নয়, প্রাসাদ দ্বারের বাইরেও লক্ষহীরার দর্শন কামনায় ওঁরা দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকেন।

কালিদাস—তবু ওঁরা সম্ভ্রান্ত অতিথি। প্রথম এসেছেন—আগে প্রথমাগতদের সম্বর্ধনা কর, তারপর—

লক্ষহীরা—প্রথমাগত ওঁরা নন্—ওঁরা আমাদের চির পরিচিত—চির পুরাতন। প্রথমাগত তুমি, নব-বসন্তের দূত হয়ে এসেছ। এসো, বাসন্তী-গীতোৎসবে তোমায় স্বাগত সম্ভাষণ জানাই—

কালিদাস—না না, এখানে এসে আমি যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ

করছি—কুণ্ঠিত হচ্ছি—অভ্যাগতের এ অনাদর দেখে। ওঁদের সঙ্গে তোমার প্রয়োজন শেষ করো। আমি বরং আর একদিন আসব—

লক্ষহীরা—তা কি হয় বন্ধু, অনাহুত বসন্ত একবার যদি অনাদরে চলে যায়—সে আর ফিরে আসে না। তুমি অপেক্ষা কর, আমি এঁদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ এই মুহূর্তে মিটিয়ে নিচ্ছি। বলুন ভোজরাজ, আপনার শুভাগমনের কারণ বলুন—

নাগদত্ত—আগে এঁর সঙ্গে তোমার প্রয়োজন শেষ হোক, তারপর বলব—

লক্ষহীরা—এঁর সঙ্গে প্রয়োজন জীবনান্তকাল পর্যন্ত শেষ হবে না। তাহলে ততদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

নাগদত্ত—সত্যি নাকি! বেশ, তাহলে সেই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

লক্ষহীরা—তা হলে দয়া করে আসুন এবার—

নাগদত্ত—কেন? জীবনান্ত কাল পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করি?

লক্ষহীরা—সে এখানে নয়, অপেক্ষা করুনগে আপনার প্রাসাদ বাতায়নে—

নাগদত্ত—এখানে অপেক্ষা করতে বাধা আছে নাকি?

লক্ষহীরা—আছে বৈকি।

নাগদত্ত—বাধাটা কি, জানতে পারলে উপকৃত হতুম।

লক্ষহীরা—দেবপূজার সময় মন্দির আবর্জনা-মুক্ত করতে হয়। এ কথাও কি ভোজরাজের জানা নেই?

নাগদত্ত—দেবপূজা ? এ দেবতার পরিচয় জানতে পারি কি ?

লক্ষহীরা—মহারাজ, এ অনর্থক কৌতূহল দমন করলেই আমি খুশী হব।

নাগদত্ত—তবু, জেনে রাখা ভাল, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি—এই ছদ্মবেশী কন্দর্পের নাম ?

লক্ষহীরা—নাম জানায় আপনার কোনো প্রয়োজন নেই। যান্ আর বিলম্ব করবেন না। পূজার লগ্ন এসে গেলে গৃহ আঙ্গিনার আবর্জনা কি করে অপসারিত করতে হয়, ভোজরাজ নিশ্চয়ই তা অজ্ঞাত নন্!

নাগদত্ত—না অজ্ঞাত নই। আবর্জনা! ভোজরাজ তোমার গৃহে আবর্জনা! কিন্তু এই আবর্জনা স্তূপ থেকেই তুমি একদিন হাত পেতে অগ্রিম গ্রহণ করেছ, তার বিনিময় কিন্তু আজও আমি পাইনি।

লক্ষহীরা—ওঃ স্মরণ হয়েছে। আপনি আমাকে নাচবার জন্য দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অগ্রিম দিয়েছিলেন, তাই নয় ? কুসুমিকা —কুসুমিকা—

(কুসুমিকার প্রবেশ)

এঁকে দুইলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দে।

কুসুমিকা—আমি যে স্নান করতে যাচ্ছি। এ সময় সিন্দুক ছোঁব কি করে ?

লক্ষহীরা—ওঃ তবে এক কাজ কর, গৃহের ভৃত্য ও পরিচারিকাদের বেতন দেবার জন্যে তোর কাছে কত স্বর্ণমুদ্রা রেখেছি যেন ?

কুসুমিকা—তিন লক্ষ।

লক্ষহীরা—যা, ভোজরাজকে সঙ্গে করে নিয়ে যা। তা থেকে দুই লক্ষ—না তিনলক্ষ দিবি। যান ভোজরাজ, নিয়ে যান। দুই লক্ষ আপনার দেওয়া অগ্রিম দাদন, আর এক লক্ষ সেই দাদনের সুদ।

নাগদত্ত—কিন্তু এর পরিণাম একবার ভেবে দেখলে পারতে লক্ষহীরা—

লক্ষহীরা—ভেবে দেখা! হিসাব করা! (হাসিল) হিসেব করবেন আপনারা, যাঁরা রূপের জন্যে সোনা-রুপো ব্যয় করেন; রূপ দিয়ে যারা রুপো নেয় তারা রুপোর হিসেব করে না, হিসেব রাখে তারা রুপো জয় করা রূপের। আসুন এবার, নমস্কার।

নাগদত্ত—হুঁ, আচ্ছা। এসো শূরসেন।

[কুসুমিকা সহ না৲দত্ত ও শূবসেনেব প্রস্থান

লক্ষহীরা—এসো বন্ধু, এসো কালিদাস, এইবার আসন গ্রহণ কর—

(হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল)

কালিদাস—কিন্তু, আমি যেন কেমন বিব্রত বোধ করছি, মনে হচ্ছে আমার এখানে না আসাই ছিল ভালো—

লক্ষহীরা—কেন? একথা কেন?

কালিদাস—আমার জন্যে তুমি ওঁদের অমন অপমান করে তাড়িয়ে দিলে?

লক্ষহীরা—অপমান? অপমান বোধ ওদের নেই কালিদাস।

সুদর্শনা নারীর কাছে পাওয়া অপমানকে ওরা মনে করে চন্দন-পরশ। আর বিশেষ করে ঐ ভোজরাজ নাগদত্ত।

কালিদাস—ভোজরাজের প্রতি তোমার এ আক্রোশ কেন বলো তো—

লক্ষহীরা—কেন! না, থাক সে কথা, আজ তুমি এসেছ · আজ শুধু তোমার কথাই শুনবো। সেদিন আমার কাছে যে বস্তু চেয়ে পাওনি, বল, কোথায় পেলে সেই বিদ্যা, কোথায় পেলে সেই জ্ঞান?

কালিদাস—জ্ঞান পেয়েছি, বিদ্যা পেয়েছি, তুমি কি করে জানলে?

লক্ষহীরা—বনপথে কস্তুরীমৃগ চলে যায়—দিকে দিকে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে মৃগনাভি গন্ধ। তোমার কপালের দীপ্তি, তোমার দু'চোখে ঠিকরে পড়া আলো, তোমার প্রতিটি কথার ভঙ্গিমায়—স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—তুমি এমন কোনো বিদ্যা, এমন কোন মহাজ্ঞান পেয়েছ—যা অমৃত-লোক আর মর্তের মাটির সঙ্গে মিলনের রাখী বেঁধে দেবে। বলো বন্ধু, কোথায় কার কাছে, কেমন করে পেলে এই মহা-ঐশ্বর্য?

কালিদাস—ঐশ্বর্য আমি পেয়েছি লক্ষহীরা, পেয়েছি তাঁরই অনুগ্রহে, যাঁর আশীর্বাদে মূক ব্যক্তিও কথা বলে, পঙ্গু পর্বত লঙ্ঘন করতে সাহসী হয়। বাণী বাগেদবী আমায় দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন,—আমি হব বিশ্বজয়ী মহাকবি।

লক্ষহীরা—বাণী বাগেদবীর দেখা পেয়েছ! স্বয়ং বাগেদবীর

আশীর্বাদ "তুমি হবে বিশ্বজয়ী মহাকবি"! কালিদাস, সমস্ত জগৎ তোমায় বন্দনা করবে। কিন্তু সবার আগে বন্দিত করব তোমায় আমি, বিশ্বকবির বন্দনার প্রথম গৌরব লাভ করবে এই বিশ্বনিন্দিতা রূপ-পশারিণী—

(লক্ষহীরা নৃত্য আরম্ভ করিল)

কালিদাস—অপরূপ—অপরূপ নৃত্য—

লক্ষহীরা—তুমি খুশী হয়েছ ?

কালিদাস—এত খুশী জীবনে আর কখনো হইনি। মনে হল যেন স্বর্গ-মন্দাকিনী নৃত্যছন্দে নেমে এলেন তৃষিত মর্তবাসীকে পরিতৃপ্ত করতে। এমন নৃত্য আমি জীবনে কখনো দেখিনি—

(নৃত্যের মধ্যস্থলে বিক্রমাদিত্য আসিয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই। এইবার তিনি সম্মুখে আসিলেন।)

বিক্রমাদিত্য—অভিনব, এ নৃত্যের সৃষ্টি হল আজই এই প্রথম।

লক্ষহীরা—সম্রাট জয়তু।

কালিদাস—সম্রাট !

লক্ষহীরা—ভারতেশ্বর, গুণীজন পালক, স্বয়ং বিক্রমাদিত্য।

কালিদাস—আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট।

বিক্রমাদিত্য—লক্ষহীরা, কে এই সৌম্যদর্শন মহান অতিথি—যাঁর আপ্যায়নে তুমি আজ এমন অপরূপ নৃত্যকলা প্রদর্শন করলে ? যে নৃত্য ইতঃপূর্বে ভারত সম্রাটের দেখবার সৌভাগ্য হয়নি ?

লক্ষহীরা—সম্রাট, ইনি বাগেদবীর আশীর্বাদধন্য নবোদিত কবি-ভাস্কর কালিদাস।

বিক্রমাদিত্য—নবোদিত কবি-ভাস্কর কালিদাস! তোমার কাব্যসুধা আস্বাদনের ইচ্ছা করি কবি!

কালিদাস—সম্রাট জয়তু!

যাবদ্বীচিতরঙ্গান্ বহতি সুরনদী জাহ্নবী পুণ্যতোয়া
যাবচ্চাকাশমার্গে তপতিহি ভুবনং ভাস্করো লোকপালঃ
যাবদ্ব্রজেন্দ্রনীল স্ফটিক মণিশিলা বিদ্যতে মেরুশৃঙ্গে
তাবৎ পুত্রৈশ্চ পৌত্রেঃ স্বজন পরিবৃতো ভুংক্ষ্বরাজং
নৃপালম্॥

যতকাল ধরি ঊর্মি মুখর বহিবে গঙ্গাধারা—
যতকাল মাঝে গগণে সূর্য হবে না আলোকহারা।
রবে যতকাল সুমেরু শিখরে স্ফটিক ইন্দ্রনীল,
তোমারই বংশ মেদিনী পালিবে, হে নৃপ পুণ্যশীল॥

বিক্রমাদিত্য—অপরূপ, অভিনব তোমার এ শ্লোক! এমন স্তুতিগান আমি এর আগে আর কখনো শুনিনি কবি। লক্ষহীরা, এমন অমূল্যনিধি তুমি কোথা থেকে আহরণ করলে?

লক্ষহীরা—সম্রাট, উনি অনেক দূর দেশ থেকে এসেছেন। আপনি যদি এঁকে আপনার স্নেহছায়ায় আশ্রয় দেন—এই নব অঙ্কুরিত কবি-প্রতিভা বোধ হয় একদিন মহাবৃক্ষে পরিণত হবে।

বিক্রমাদিত্য—দেব, নিশ্চয়ই এঁকে আমি আশ্রয় দেব। ইনি

বহুদূর থেকে এসেছেন তবু মনে হয় ইনি যেন আমার কত আপনার, ইনি যেন আমার পরম মিত্র। দূরে থেকে আমাদের এ মিত্রতা কী করে জন্মাল কবি ?

কালিদাস—শুনুন সম্রাট—

গিরৌ কলাপী গগনেচ মেঘা—
লক্ষান্তরেহর্কঃ সলিলে চ পদ্মম্
দ্বিলক্ষ দূরে কুমুদস্য নাথো—
যো যস্য মিত্রং নহিতস্য দূরম্ ॥

গিরিতে কলাপীকেকা, নভে মেঘদল,
লক্ষ যোজনে রবি, জলেতে কমল।
কুমুদিনী নাথ চাঁদ, আরও বহুদূর,
বাঁশরীতে বাজে তবু মিলনের সুর।
বন্ধু, সখা, প্রিয়জন যত দূরে যায়,
অন্তরের প্রীতি প্রেম দূরত্ব ঘুচায় ॥

বিক্রমাদিত্য—চমৎকার, আমি মুগ্ধ, আমি বিস্মিত। বাগ্দেবী নিশ্চয় তোমার জিহ্বাগ্রে আসীনা। লক্ষহীরা, এ দিব্য প্রতিভাকে আমি কি দিয়ে বরণ করি ?

(কুসুমিকার পুষ্পমাল্যাদি লইয়া প্রবেশ)

কুসুমিকা—সম্রাট জয়তু !

বিক্রমাদিত্য—কি এনেছ কুসুমিকা ?

কুসুমিকা—দেবীর মালঞ্চের ফুল দিয়ে গাঁথা সম্রাটের বর-মাল্য—

বিক্রমাদিত্য—না ও মালা শোভা পাবে আজ ভারত সম্রাটের

কণ্ঠে নয়, যিনি সম্রাটের চেয়ে বরণীয় ও মালা শোভা পাক সেই কবি-সম্রাটের কণ্ঠে। (কালিদাসকে মালা পরাইলেন) লক্ষহীরা, তোমার গৃহে এসে আজ আমি যে রত্ন লাভ করলুম—তাকে স্থাপন করতে নিয়ে যাচ্ছি আমার নবরত্ন সভার মধ্যমণি রূপে। নবরত্নের কিরীট-মণি হবেন এই মহাকবি কালিদাস।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সরস্বতী মন্দির সংলগ্ন বন।)

॥ সত্যবতী ও বাণীকণ্ঠ ॥

সত্যবতী—নবরত্নের মধ্যমণি কবি কালিদাসের খ্যাতি আমিও শুনেছি বাণীকণ্ঠ। কিন্তু একই নামে কি দুই ব্যক্তি থাকতে পারে না? আমার স্বামীই যে উজ্জয়িনীর নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন তা আপনি কি করে বুঝলেন?

বাণীকণ্ঠ—রাজকন্যা, এখনো তোমার মনে সন্দেহ? নিঃসম্পর্কীয় এই দীন পূজারী যাঁর গৌরবে নিজেকে ধন্য মনে করে, পত্নী হয়ে তুমি তোমার সেই স্বামীকে চিনতে পার না?

সত্যবতী—কিন্তু তিনি ছিলেন গণ্ডমূর্খ। উষ্ট্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারতেন না।

বাণীকণ্ঠ—রাজকন্যা, তিনি আজ যদি ইচ্ছা করেন একটি উষ্ট্র

নয়, শত সহস্র উষ্ট্র। তাঁর জন্য সুবর্ণ ভাণ্ডার পৃষ্ঠে নিয়ে তাঁরই প্রাসাদ দ্বারে সমাগত হয়।

সত্যবতী—শুনেছি তিনি "রঘুবংশ" রচনা করেছেন। এই কাব্য কি ভাবে আরম্ভ করেছেন—আপনি জানেন?

বাণীকণ্ঠ—জানি দেবী, প্রথম ছত্র আরম্ভ হয়েছে "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা—"

সত্যবতী—"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি।" "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্ বিশেষ।" অস্তি বাক্য দিয়ে রঘুবংশ আরম্ভ। তবে কি?

বাণীকণ্ঠ—কি রাজকন্যা?

সত্যবতী—না, কিছু না, আর কোনো কাব্যরচনা সমাপ্ত হয়েছে?

বাণীকণ্ঠ—শুনেছি নূতন সমাপ্ত কাব্য তাঁর "মেঘদূত।"

সত্যবতী—আরম্ভ?

বাণীকণ্ঠ—"কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা—"

সত্যবতী—কশ্চিৎ! "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্ বিশেষ।"

বাণীকণ্ঠ—তুমি কি বলছো রাজকন্যা! আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।

সত্যবতী—পূজারী, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। গণ্ডমূর্খ বলে বাসর-ঘর থেকে যাঁকে অপমান করে বার করে দিয়েছিলুম, তিনি আজ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন, মহাকবি কালিদাস! না না, এ বিপুল সৌভাগ্য, বাগ্দেবীর এ অকল্পিত করুণা···আমি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তবু, তবু মন আমার

বলছে, 'ওরে সত্যবতী, বিশ্বাস কর—ওই মহাকবিই তোর লাঞ্ছিত স্বামী।'

বাণীকণ্ঠ—আমিও বলছি বিশ্বাস কর রাজকন্যা তিনি আর কেউ নন্—তিনিই তোমার স্বামী।

সত্যবতী—পূজারী, আমায় একবার নিয়ে যেতে পার উজ্জয়িনীতে? আমি স্বচক্ষে একবার দেখে আসব তাঁকে—

বাণীকণ্ঠ—বেশ, ইচ্ছা হয় চলো—

সত্যবতী—না থাক্—আমি যাব না—

বাণীকণ্ঠ—কেন রাজকন্যা?

সত্যবতী—একদিন আমি তাঁকে অপমান করেছিলুম, আজ যদি তিনি আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দেন?

বাণীকণ্ঠ—ছিঃ একথা তুমি ভাবতে পারলে রাজকন্যা? বিশ্ব-বন্দিত মহাকবি তিনি, তাঁর কাছে লাঞ্ছনা পাবে তুমি—তাঁর ধর্মপত্নী? "মেঘদূতের" বিরহী যক্ষ, রামগিরি শিখরে বসে নব মেঘকে দূত রূপে পাঠাচ্ছেন তাঁর বিরহিনী প্রিয়তমার কাছে। অলকাপুরীতে কেমন করে পৌঁছুতে হবে, পরম আগ্রহ ভরে সেই পথের নিশানা দিয়ে, বিরহী যক্ষরাজ বসে আছেন তোমারই মিলন প্রতীক্ষায় প্রতি পল গণনা করে। সেই বাঞ্ছিতা প্রিয়তমাকে লাঞ্ছনা দেবেন যক্ষরাজ?

সত্যবতী—পূজারী—

বাণীকণ্ঠ—কোন সঙ্কোচ রেখো না মনে, চলো আমরা উজ্জয়িনী

যাই। পথে যেতে গীতছন্দে মুখর করে তুলি বিরহী যক্ষের সেই আকুল ক্রন্দন—

গান

তনুদেহলতা চিকণ শ্যামল
তুষার ধবল দন্তরুচি
পক্ক বিম্বফলের রাঙিমা
অধরে ও ঠোটে রাঙাল বুঝি।
কটিতট ক্ষীণ, সুগভীর নাভি,
চকিত চাহনি হরিণী প্রায়,
নিতম্ব ভারে চলে ধীরে ধীরে
ক্লান্ত কোমল অলস পায়।
ঈষৎ আনত সমুখের পানে
নিটোল যুগল স্তনের ভারে,
ধরণীর মাঝে যত নারী আছে
বিধাতা প্রথম রচিল তারে॥

[গানের শেষে উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

(উজ্জয়িনীর কন্দর্প মন্দির সংলগ্ন উপবন রাত্রিকাল)

॥ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস ॥

বক্রমাদিত্য—কই 'মহাকবি, তোমার 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক রচনা এখনও শেষ হল না? উজ্জয়িনী রঙ্গমঞ্চের স্থপতি ও শিল্পীরা আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন নাটকের শেষ অংশ শোনবার জন্যে।

কালিদাস—আগামী সপ্তাহেই রচনা শেষ হবে সম্রাট।

বিক্রমাদিত্য—পাণ্ডুলিপির যতটা পর্যন্ত রচনা করেছ, আজ শুনতে পাবো তো?

কালিদাস—সম্রাটের অভিরুচি হলেই শোনাব। দেবী লক্ষহীরা পাণ্ডুলিপি নিয়ে এখুনি এসে পৌঁছবেন।

বিক্রমাদিত্য—শুনতে পাই, লক্ষহীরার গৃহে বসেও তুমি মাঝে মাঝে কাব্য রচনা কর?

কালিদাস—বরবর্ণিনী নারীর স্বর্ণ দ্যুতি সম্মুখস্থ দীপবৃক্ষের আলোকে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করে তোলে। লীলা-চঞ্চলা কামিনীর সুরভি নিশ্বাস কস্তুরী ধূপগন্ধকে আরও মধুর আরও মদির করে তোলে। লেখনী আমার স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলে সম্রাট।

বিক্রমাদিত্য—ঠিক বলেছ কবি, রচনার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ। ওই যে, উপবন পথে লক্ষহীরা আসছে। কবরী বন্ধনে আজ দেখছি কুরুবক বা মালতি মালা নেই। শুধুই বন্ধন। আচ্ছা বলতো কবি,—অমন তরঙ্গায়িত কেশ—রমণীরা তাকে বেঁধে রাখে কেন?

কালিদাস—সম্রাট, যুদ্ধে জয়লাভের পর যে সকল সৈন্য, সেনাপতি যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাঁদের তো আপনি সেই অনুযায়ী পুরস্কার দান করেন? যে ভীরু যুদ্ধের সময় পশ্চাদপদ হয় সে পুরস্কার পায় না—তার ভাগ্যে জোটে বন্ধন। এ ক্ষেত্রেও তাই।

বিক্রমাদিত্য—অর্থাৎ!

কালিদাস—অর্থাৎ বরনারী কন্দর্প যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপ সেনাপতিদেরও যোগ্য পুরস্কার দেন। কে কি পায় শুনুন ঃ

অনঙ্গ রণে সহায়তা করি
কটীতট লভে কিঙ্কিনী
স্তন যুগে হার, হস্তে বলয়
চরণে নূপুর সিঞ্জিনী ॥
নিতম্ব লভে মানিক মেখলা
তাম্বুল শোভে অধরে।
কেশপাশ রণে পশ্চাতে থাকে
তাইতো বাঁধিল তারে।

বিক্রমাদিত্য—সুন্দর, অনুপম এ শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য।

(লক্ষহীরার প্রবেশ)

এসো এসো রাজনটী লক্ষহীরা। কই কবির নাটকের পাণ্ডুলিপি কই ?

লক্ষহীরা—পাণ্ডুলিপি আনিনি মহারাজ।

বিক্রমাদিত্য—কেন ?

লক্ষহীরা—এ উপবনে এখনি মূর্তিমান রাহুর আবির্ভাব হবে আশঙ্কা হচ্ছে। এ সময় কাব্য সুধা পান করা চলবে না। বিপদ ঘটতে পারে।

কালিদাস—এ কি অন্যায় কথা বললে দেবী, রাহুর আবির্ভাবে কাব্যানুশীলনে বাধা কি ?—ভয় তো তোমার। তুমি বরং ঐ লতাকুঞ্জের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়।

লক্ষহীরা—আমি লুকুবো ? কেন ?

কালিদাস—কেন ? মনে নেই আমার শৃঙ্গার তিলকের সেই শ্লোক ?

যাও যাও গৃহে, ও মুখ দেখিলে
শোনো ওগো মনোরমা,
চন্দ্রে ত্যজিয়া এখনি যে রাহু
গ্রাসিবে বদন-চন্দ্রমা ॥

সুতরাং ভয় তোমার—আর কারুর নয়।

লক্ষহীরা—সত্যই ভয় আমার, তোমার যদি কোন লাঞ্ছনা হয় কবি, সে আমার, সে আমাদের সকলের মহাভয়।

বিক্রমাদিত্য—কবির লাঞ্ছনা হবে ? কি বলছ লক্ষহীরা ? কে এমন দুঃসাহসী যে মহাকবি কালিদাসকে লাঞ্ছিত করবে ?

লক্ষহীরা—সম্রাট, সে ভোজরাজ নাগদত্ত।

বিক্রমাদিত্য—নাগদত্ত !

লক্ষহীরা—কবি আমার গৃহে বসে নাট্য রচনা করেন এই সংবাদ শুনে সে আমার গৃহে এসেছিল। কবির সাক্ষাৎ না পেয়ে অতি ইতর ভাষায় কবির উদ্দেশ্য নিন্দা করতে লাগল।

বিক্রমাদিত্য—কি বলল কবির সম্বন্ধে ?

লক্ষহীরা—সে আমি বলতে পারবো না সম্রাট। আমায় মার্জনা করুন, সে ভাষা আমি উচ্চারণ করতে পারব না। পাণ্ডিত্যের এত দম্ভ হয়েছে ওই ভোজরাজের যে কবি কালিদাসকে বলে মহামূর্খ।

বিক্রমাদিত্য—মহামূর্খ ভারতীর বরপুত্র কালিদাস? ভোজরাজ নাগদত্ত কি উন্মাদ হয়ে গেছে—

কালিদাস—না সম্রাট, তিনি তো কোন প্রলাপ বাক্য বলেননি। সত্যই তো আমি মহামূর্খ—দেবীর দয়া যতক্ষণ বর্ষিত হবে আমার মস্তকে, ততক্ষণ—ততক্ষণ শুধু আমি মহাকবি। নতুবা যে মূর্খ সেই মূর্খ।

বিক্রমাদিত্য—দেবীর করুণা জীবনান্ত কাল পর্যন্ত তোমার পরম সম্পদ। সব ঐশ্বর্য হারাতে পারে কিন্তু বিদ্যারূপী ঐশ্বর্য কখনও হারায় না, কখনো তার তিলমাত্র ক্ষয় নেই।

লক্ষহীরা—সম্রাট, ওই দেখুন, উপবন তোরণ পথে ভোজরাজ আসছে! ওকে নিষেধ করুন সম্রাট, এখানে আসতে।

বিক্রমাদিত্য—কন্দর্প মন্দিরে পূজা আরতির সময় মন্দির এবং উপবন পথ সবারই জন্য অবারিত। ওঁকে তো আসতে বাধা দিতে পারি না।

লক্ষহীরা—তাহলে নিষেধ করুন—কবিকে লাঞ্ছিত করতে!

বিক্রমাদিত্য—ভোজরাজ নাগদত্ত আমার পিতৃবন্ধুর পুত্র, সে আমার ভ্রাতৃতুল্য। কিন্তু তবু একথা নিশ্চিত জেন, কবি কালিদাসকে অনর্থক লাঞ্ছিত করলে সে কিছুতেই ক্ষমা পাবে না।

কালিদাস—আপনারা আমার কথা ভেবে এত বিব্রত হচ্ছেন কেন? আমার অনুরোধ, আপনারা নীরব হয়ে থাকুন। ভোজরাজ যদি দুষ্টা-সরস্বতীর তাড়নায় আমায় লাঞ্ছিত

করতে চান—তার সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবার শক্তিও আমার আছে।

(ভোজরাজ নাগদত্তের প্রবেশ)

নাগদত্ত—সম্রাট জয়তু—

বিক্রমাদিত্য—এসো এসো বন্ধু নাগদত্ত, আসন গ্রহণ কর।

নাগদত্ত—সম্রাট কি আজ কন্দর্প উপবনে নবরত্ন সভার আয়োজন করেছেন নাকি ?

বিক্রমাদিত্য—না নবরত্ন নয়। নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্নটিকে নিয়েই আজ কন্দর্প উপবনে এসেছি।

নাগদত্ত—নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ?

বিক্রমাদিত্য—ঐ তোমার সম্মুখে মহাকবি কালিদাস—

নাগদত্ত—মহাকবি কালিদাস ! হাঃ হাঃ হাঃ···

বিক্রমাদিত্য—হাসছো যে ?

নাগদত্ত—হাসছি মহাকবি দর্শনের আনন্দে।

কালিদাস—না, মহামূর্খ মহাকবির আসনে বসেছে, তাই ভোজরাজ হাসছেন, পরম কৌতুকে।

নাগদত্ত—মহামূর্খ ! ওঃ, রাজনটী লক্ষহীরা তাহলে ইতঃমধ্যে গুপ্তদূতীর কর্তব্য শেষ করেছেন ?

কালিদাস—না, সূচনা করেছেন।

নাগদত্ত—অপরাধ নেবেন না সম্রাট, আমি স্বীকার করছি—লক্ষহীরার কাছে আমি বলেছি কালিদাস মহামূর্খ এবং সে যে মহামূর্খ সম্রাটের অনুমতি হলে তা আমি প্রমাণ করতে পারি।

বিক্রমাদিত্য—বল কি তোমার প্রমাণ? যদি প্রমাণ দিতে না পার, নিশ্চিত জেনো, আমার সভাকবিকে অপমান করবার যোগ্য প্রতিফল তোমায় গ্রহণ করতে হবে।

কালিদাস—ক্রুদ্ধ হবেন না সম্রাট। এই চন্দ্রমাফুল্ল রাতে কন্দর্প উপবনের রহস্যালাপকে রাজ-রোষে দগ্ধীভূত করবেন না। রসিক সজ্জনের সঙ্গে যোগ্য ভাষায় রহস্যালাপ করবার ভার আমার উপর ছেড়ে দিন। বলুন ভোজরাজ, আপনি কি বলতে চান?

নাগদত্ত—শুনতে পাই, তুমি রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি মহাকাব্য রচনা করেছ। কিন্তু আমি যদি বলি, সেগুলি তোমার রচনা নয়?

কালিদাস—আপনি বলবেন কেন, আমিই স্বীকার করছি, ও সব মহাকাব্য আমি রচনা করিনি।

নাগদত্ত—স্বীকার করছ? বল কে রচনা করেছে?

কালিদাস—রচনা করেছেন স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতী।

নাগদত্ত—বাগ্‌দেবী সরস্বতী?

কালিদাস—হ্যাঁ। আমার হাত তাঁরই আদেশে তাঁরই বাণী লিপিবদ্ধ করেছে শুধু।

নাগদত্ত—যে মনোরম পরিবেশে, দুগ্ধ-ফেন শয্যায় বসে তুমি লেখনী চালনা কর তোমার বাগ্‌দেবী সরস্বতী কি সেই প্রাসাদের অধিশ্বরী ওই লক্ষহীরা?

কালিদাস—বরনারীর আতপ্ত সান্নিধ্য না পেলে কোন কবি কি

কোনদিন কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন? সুন্দরী দেয় প্রেরণা, লেখনী দেয় লিপি।

নাগদত্ত—হুঁ। একটী নূতন শ্লোক সম্রাটের সম্মুখে রচনা কর দেখি মহাকবি।

কালিদাস—কি করে করব? কাব্যের কমল বনে মদমত্ত মাতঙ্গ প্রবেশ করেছে যে? কমল বন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। সরস্বতী আসন গ্রহণ করবেন কোথায়?

নাগদত্ত—বাকপটুতা রাখ, হয় সম্রাটের সম্মুখে কাব্য রচনা কর, নতুবা স্বীকার কর তুমি পরাজিত।

কালিদাস—আমি পরাজিত। সত্যিই আমি কাব্য রচনার কোন নিয়মই জানি না। শুনেছি আপনি মহাপণ্ডিত, দেশ-প্রসিদ্ধ কবি। তাই আপনার কাছে আমি শুধু পরাজিতই নই, আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি।

নাগদত্ত—এও কি পরিহাস?

কালিদাস—পরিহাস নয়। সত্য বলছি, আপনি আমাকে দয়া করে শিখিয়ে দিন কি করে কাব্য রচনা করতে হয়?

নাগদত্ত—শোনো তবে—শ্লোক রচনার প্রথম নিয়ম হচ্ছে, তাতে চারটী চরণ থাকবে, থাকবে একটু রস, আর দু একটি ক্রিয়াপদ। বুঝলে?

কালিদাস—চারটি চরণ, একটু রস, আর ক্রিয়াপদ। ভোজরাজ, আপনার উপদেশ মত আমি মনে মনে একছত্র শ্লোক রচনা করে ফেলেছি।

নাগদত্ত—কি শ্লোক?

কালিদাস—"দুগ্ধং পিবতি মার্জারঃ"। বিড়াল দুধ খাইতেছে। এ কবিতাটি রসাত্মক হয়েছে ভোজরাজ ?

নাগদত্ত—মূর্খ! এ আবার একটি কবিতা হল নাকি ?

কালিদাস—কেন হবে না! বিড়ালের চারটি চরণ আছে, দুধের চেয়ে সরস আর কি বস্তু আছে? সেই সঙ্গে "পিবতি" ক্রিয়াপদও রয়েছে। তবে এটা কেন কবিতা হবে না ?

বিক্রমাদিত্য—হাঃ হাঃ হাঃ। উত্তর দাও ভোজরাজ ?

লক্ষহীরা—দেখুন সম্রাট, মার্জার লুকিয়ে দুগ্ধ পান করতে গিয়ে গৃহস্থের হাতে ধরা পড়লে তার যে অবস্থা হয়—ভোজরাজ ভোজবাজিতে পরাজিত হয়েও ঠিক সেই রকম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন।

নাগদত্ত—না, ভোজরাজ অত সহজে পরাজিত হয় না। কবি কালিদাসের যদি সাহস থাকে তাহলে আমি তাকে আহ্বান করছি, এই মুহূর্তে এমন আর কয়েক ছত্র শ্লোক রচনা করুন যা সত্যই অভিনব। যা ইতঃপূর্বে কেউ কখনও শোনেনি।

কালিদাস—নূতন শ্লোক রচনা করলে ভোজরাজ কি করবেন ?

নাগদত্ত—লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দেব। কিন্তু স্মরণ রেখো কবি, যদি সে শ্লোক সম্পূর্ণ নূতন না হয় তাহলে বুঝবো তুমি প্রবঞ্চক। প্রবঞ্চনা করে সম্রাটের নবরত্ন সভায় আসন নিয়েছ। সে আসন তাহলে তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে।

কালিদাস—বেশ তাই হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—

লক্ষহীরা—না, না, কবি, প্রতিজ্ঞা কোরো না। ভোজরাজ শ্রুতিধর, একবার শোনামাত্র যে কোনো নূতন শ্লোক ওঁর কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। সেই শ্লোক পুনরাবৃত্তি করে উনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে উপহাস করে বলেন "এ শ্লোক নূতন নয়। এ আমি জানি।" উনি কোন শ্লোককেই নূতন বলে স্বীকার করবেন না। আমার অনুরোধ, তুমি—

কালিদাস—স্থির হও লক্ষহীরা, সাধ্য কি শ্রুতিধর ভোজরাজের যে কালিদাসকে নবরত্ন সভার সিংহাসনচ্যুত করেন? ওঁকে আমি এমন শ্লোক শোনাব যা শুনে উনি আমায় প্রতিশ্রুত লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দিতে বাধ্য হবেন।

নাগদত্ত—উত্তম, শুনি তোমার সেই অভিনব শ্লোক।

কালিদাস—শুনুন তবে

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ! ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্মিক সত্যবাদী
পিত্রাতে মে গৃহীতা নব নবতিযুতা রত্ন কোটি র্মদীয়া
তত্ত্বং মে দেহিতূর্ণং সকল বুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নোবা জানন্তি কেচিৎ নবকৃত মিতি চেদ্দেহি
লক্ষং ততো মে।

শুভ হোক রাজা, ধার্মিক তুমি
ভুবন বিজয়ী সত্যবাদী
তব পিতা নিল আমার নিকট
কোটী ঊনকোটী রত্ন আদি।

এ ঋণের কথা জান তুমি নিজে

জানেন তোমার সভার লোক।

পরিশোধ কর পিতার সে ঋণ—

আত্মা তাঁহার তৃপ্ত হোক।

যদি তুমি বল, জানেনাকো কেহ,

তবেতো এ কথা নূতন মম,

নূতন শ্লোকের রচনা মূল্য

দাও মোরে তবে সুবোধ সম॥

বিক্রমাদিত্য—ধন্য, ধন্য কবি, তোমার উপস্থিত বুদ্ধি। ভোজরাজ নাগদত্ত, কি করবে বল? এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ রত্ন পিতৃঋণ বলে স্বীকার করবে, না এই শ্লোককে নূতন শ্লোক বলে মেনে নিয়ে প্রতিশ্রুতি মত লক্ষ সুবর্ণ পুরস্কার দেবে?

লক্ষহীরা—উত্তর দিন ভোজরাজ? এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন কেন? পলায়ণের পথ খুঁজছেন নাকি? ভয় নেই, পলায়ণ করতে হবে না। কবিকে প্রণাম করুন। উনি আপনাকে ঋণ মুক্ত বলে স্বীকার করবেন।

নাগদত্ত—না কারুর দয়ায় আমি ঋণ মুক্ত হতে চাই না। আমার স্বর্গগত পিতার হস্ত লিখিত একখানি সঙ্কেত লিপি আমি পেয়েছি। তাতে লেখা আছে "আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্ন কালে আমি কন্দর্প উপবন সংলগ্ন তালবৃক্ষের উপর এক কলসী-পূর্ণ রত্ন রাখিলাম। আমার বংশধরেরা সেই রত্ন গ্রহণ করিবে।" এই নাও কবি কালিদাস, আমি

সেই লিপি তোমায় দান করছি। এই লিপির নির্দেশ অনুযায়ী তুমি সেই রত্ন গ্রহণ করগে।

(লিপি দিলেন)

কালিদাস—আষাঢ়ান্ত দিবসে তালবৃক্ষের উপর রত্নের কলসী স্থাপন! উত্তম, আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি এখনি রত্ন উদ্ধার করে নিয়ে আসছি। এস লক্ষহীরা, তুমি আমায় একটু সাহায্য করবে।

[কালিদাস ও লক্ষহীরার প্রস্থান

বিক্রমাদিত্য—এ নিদর্শন লিপির অর্থ কি ভোজরাজ—

নাগদত্ত—সম্রাটের নিশ্চয় স্মরণ আছে, এই কন্দর্প উপবনের পার্শ্বের উপবনটি আপনার পিতা বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আমার পিতাকে দান করেছিলেন।

বিক্রমাদিত্য—তাতো জানি। কিন্তু ওই লিপির অর্থ?

নাগদত্ত—অর্থ অতি সহজ। সেই উপবনের তালবৃক্ষটির উপরে আমার পিতা রত্নের কলসী রেখে দিয়েছেন।

বিক্রমাদিত্য—একি অসম্ভব কথা! তালবৃক্ষের উপর কেউ কখনো রত্নের কলসী রাখে? আর যদিই বা রাখে, চোর ডাকাতের দৃষ্টি এড়িয়ে তা কি এতদিন সেখানে থাকতে পারে?

নাগদত্ত—কিন্তু আপনার নবরত্ন সভার মধ্যমণি মহাকবি কালিদাসের বিশ্বাস তালগাছের উপরেই কলসী রয়েছে। তাই তিনি সেই রত্ন উদ্ধার করতে গেলেন লক্ষহীরাকে নিয়ে। দেখুন কি রত্ন তিনি আহরণ করে আনেন?

(কালিদাস, লক্ষহীরা ও কলসী সহ কুসুমিকার পুনঃ প্রবেশ)

কালিদাস—এই দেখুন ভোজরাজ, আপনার পিতার রক্ষিত রত্নে পূর্ণ কলসী !

বিক্রমাদিত্য—সত্যিই তো, কি আশ্চর্য ! এ-কলসী কোথায় পেলে কবি ?

কালিদাস—পেলাম লিপি সঙ্কেত পাঠ করে।

নাগদত্ত—লিপি সঙ্কেত পাঠ করে ? কিন্তু এই লিপি অনুযায়ী আমরা কত অন্বেষণ করেছি, তবুতো—

কালিদাস—তালগাছের মাথায় রত্নের কলসী পাননি ?

নাগদত্ত—না।

কালিদাস—কিন্তু আমি পেলুম।

নাগদত্ত—সত্য বল, তালগাছের মাথায় পেয়েছো ?

কালিদাস—মাথায় নয়—পায়ের তলায়।

বিক্রমাদিত্য—তার মানে ?

লক্ষহীরা—হ্যাঁ সম্রাট, তালগাছের গোড়ার মাটী খুঁড়ে ঐ কলসী পাওয়া গেছে।

নাগদত্ত—গাছের গোড়ায় ? কিন্তু আমার স্পষ্ট স্মরণে আছে সঙ্কেত-লিপিতে রয়েছে তালগাছের মাথায় ! তবে কি আমি ভুল পড়েছি—

কালিদাস—না ভুল নয় ভোজরাজ, লিপিতে ওই কথাই রয়েছে। তবে পাঠোদ্ধারে ভোজরাজ কিছু ভ্রম করেছেন ; "আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্ন কালে তালবৃক্ষের উপর"···আষাঢ় মাসের শেষ দিকের দুপুরবেলা তালগাছের মাথা ও পা এক

হয়ে যায় অর্থাৎ গাছের ছায়া পড়ে ঠিক গাছের গোড়ায়। তাই সেখানকার মাটি খুঁড়ে এই রত্ন কলসী আমি আবিষ্কার করেছি।

বিক্রমাদিত্য—কবি কালিদাস, তোমার কবিত্বের সঙ্গে তোমার এই ক্ষুরধার বুদ্ধির সংযোগ সত্যই আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। ভোজরাজ, এ রত্নের কলসী এখন নিশ্চয়ই কবি কালিদাসের প্রাপ্য !

নাগদত্ত—হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, আমি পরাজিত। এ রত্ন কলসী কবি কালিদাসের।

কালিদাস—কিন্তু এ রত্ন নিয়ে আমি কি করব মহারাজ? এ আপনি ফিরিয়ে নিন।

লক্ষহীরা—তা হবে না, চল কবি, কন্দর্প মন্দিরের পূজা দিতে আজ যারা এসেছে তাদের মাঝখানে এ রত্ন আমরা বিতরণ করিগে—

কালিদাস—তোমার যেমন অভিরুচী।

বিক্রমাদিত্য—চলো ভোজরাজ, আমরা কন্দর্প মন্দিরে যাই—

নাগদত্ত—মার্জনা করবেন সম্রাট, আপনারা অগ্রসর হোন, আমি আজ আর অনঙ্গ পূজা দেখতে পারব না।

বিক্রমাদিত্য—কেন, কেন ভোজরাজ? সমস্ত উজ্জয়িনীবাসী আজ মন্দিব চত্বরে, আর তুমি?

লক্ষহীরা—ওঁকে অধিক ক্লেশ দেবেন না সম্রাট! এতগুলি রত্ন আমরা বিলিয়ে দেবো, তাই উনি চোখে দেখবেন? আহা! শোক বলেতো একটা বস্তু আছে।

বিক্রমাদিত্য—এসো আমরা যাই।

[বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের প্রস্থান

লক্ষহীরা—দেখ্‌, কুসুমিকা, কি রকম লাল টুকটুকে পদ্মরাগ মণি! যেন বড় বড় এক একটি জমাট রক্তবিন্দু। ওঁর বুকের রক্তে আমরা ফাগুয়া খেলব—আর ওঁকে তাই দেখতে হবে, না! না এমন নিষ্ঠুর আমরা হতে পারি না। কুসুমিকা, কলসীটা ওঁর সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিই, ওঁর শোক অপনোদন করি।

[কুসুমিকা সহ প্রস্থান

নাগদত্ত—পদ্মরাগ মণি, জমাট রক্তবিন্দু! হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে ঐ রকম বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়েই—

(শূরসেনের প্রবেশ)

কি সংবাদ শূরসেন?

শূরসেন—নগরনটী রত্নমালা এসেছে—

নাগদত্ত—আঃ রত্নমালা কেন? বলেছি ত ইন্দ্রনীল প্রাসাদে আজ রাত্রের নৃত্যগীত স্থগিত থাকবে! জানাওনি তাকে আমার অভিপ্রায়?

শূরসেন—জানিয়েছি, কিন্তু সে কিছুতেই শুনবে না। নগর-নটী সিধুপানে অত্যন্ত প্রমত্তা। সেই অবস্থাতেই সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এখানে আসছিল। তাকে ঐ যে ঐখানে রথে বসিয়ে রেখে এসেছি।

নাগদত্ত—রথে সুবর্ণ পিঞ্জরে ওটা কি পাখী?

শূরসেন—নগর নটীর শিক্ষিত পারাবত।

নাগদত্ত—পাশের মকর কেতন রথখানি লক্ষহীরার নয় ?

শূরসেন—হ্যাঁ মহারাজ।

নাগদত্ত—লক্ষহীরা! লক্ষহীরা! যে করে হোক তোমাকে—
কিন্তু বাধা ওই কালিদাস—ওই কবি কালিদাস—

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্যবতী—কোথায়! কোথায় মহাকবি! কে তাঁর নাম করছে ?

নাগদত্ত—আমি, কিন্তু আপনি ?

সত্যবতী—আমি মহাকবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি বহুদূর দেশ থেকে। উজ্জয়িনীতে এসে তাঁর প্রাসাদে গিয়েছিলাম, শুনলাম তিনি কন্দর্প উপবনে এসেছেন। আমাকে যিনি সঙ্গে করে এনেছেন তিনি আমাকে ঐ স্ফটিক বেদীতে বসিয়ে রেখে মহাকবির সন্ধানে গেছেন। হঠাৎ শুনলাম আপনারা তাঁর নাম করছেন। তাই জিজ্ঞাসা করতে এলুম, দেখছেন তাঁকে ?

নাগদত্ত—দেখেছি।

সত্যবতী—কোথায় ?

নাগদত্ত—বলছি, কিন্তু আপনার পরিচয় ?

সত্যবতী—আমি—আমি তাঁর সহধর্মিণী।—

নাগদত্ত—মহাকবি কালিদাসের সহধর্মিণী আপনি ? আপনি হয়ত মহাকবির সাক্ষাৎ পাবেন না। আর যদি বা সাক্ষাৎ পান—তাঁকে আর ফিরে পাবেন না।

সত্যবতী— কেন ? এ কথা বলছেন কেন ?

নাগদত্ত—কুহকিনী রাজনটী লক্ষহীরা, তাঁকে রূপের ফাঁদে আবদ্ধ করেছে।

সত্যবতী—রাজনটী লক্ষহীরা! না না অসম্ভব।

নাগদত্ত—আপনি অসম্ভব বলতে পারেন। কিন্তু উজ্জয়িনী নগরীতে কারও অজানা নেই—লক্ষহীরা ও কবি কালিদাসের প্রণয় কাহিনী।

সত্যবতী—তবু আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমি যাবো—আমি নিজে তাঁর কাছে যাবো! বলুন তিনি কোথায়?

নাগদত্ত—তিনি লক্ষহীরার সঙ্গে কন্দর্পের পূজা দিতে এসেছেন ঐ মন্দিরে। কারও সাধ্য নেই, রাজপ্রহরীদের এড়িয়ে সেখানে যায়—

সত্যবতী—তবে, তবে কি উপায় হবে? কি করে ওঁর সঙ্গে দেখা করবে?

নাগদত্ত—আপনি এক কাজ করুন। লক্ষহীরার নামে একখানি চিঠি লিখুন। তাতে লিখুন "বিশেষ প্রয়োজন, একবার অশোককুঞ্জের স্ফটিক বেদীর নিকট আসুন। ইতি কবি কালিদাস পত্নী।" লক্ষহীরা এলে তার মুখে সব সত্য কাহিনী শুনতে পাবেন।

সত্যবতী—কিন্তু, চিঠি লিখব কি করে? চিঠি লেখবার উপকরণ?

নাগদত্ত—ভদ্রে, এইবার হাসালেন আপনি। উজ্জয়িনীর কন্দর্প মন্দিরে এসেছেন, তবু বিনা উপকরণে গুপ্তলিপি

রচনার সঙ্কেত জানেন না? মাথায় আপনার পদ্মকলি, চোখে কাজল, খোঁপায় সোনার কাঁটা।

সত্যবতী—ওঃ বুঝেছি।

(কাঁটায় চোখের কাজল দিয়া পদ্মপাপড়ীতে চিঠি লিখিল)

কিন্তু কে নিয়ে যাবে এ চিঠি?

নাগদত্ত—সে ব্যবস্থা আমি করছি। চিঠি আমায় দিন। (পত্র গ্রহণ) শূরসেন, শিক্ষিত পারাবত। শীঘ্র।

[পত্রসহ শূরসেনের প্রস্থান

আপনি যান ভদ্রে। লক্ষহীরা হয়তো এখনি স্ফটিক বেদীর নিকট উপস্থিত হবে। আপনি যান—তার মুখে সব কথা শুনবেন।

সত্যবতী—যাই। হ্যাঁ, আপনার পরিচয়?

নাগদত্ত—ভদ্রে, অধীনের নাম চক্রপানি, সম্রাট বিক্রমাদিত্যের আমি একজন অমাত্য।

সত্যবতী—ওঃ নমস্কার।

[সত্যবতীর প্রস্থান

নাগদত্ত—লক্ষহীরা! প্রতিমুহূর্তের শ্লেষ, প্রতিমুহূর্তের অবমাননা···যদি প্রয়োজন হয় এবার রক্তের অক্ষরে তার প্রতিশোধ নেব।

(শূরসেনের প্রবেশ)

নাগদত্ত—এই যে শূরসেন! পত্র পাঠিয়েছ?

শূরসেন—পাঠিয়েছি!

নাগদত্ত—শোনো, রত্নমালাকে এবার···লক্ষহীরা আসছে। সরে

যাও। রথের কাছে প্রস্তুত থেকো। যা কর্তব্য আমি সঙ্কেতে জানাবো। যাও—

(শূরসেনের প্রস্থান। নাগদত্তের অন্তরালে গমন। লক্ষহীরার প্রবেশ এদিক-ওদিক তাকাইতেছিল, নাগদত্ত সামনে আসিল)

লক্ষহীরা—একি! ভোজরাজ!

নাগদত্ত—হ্যাঁ, কিন্তু যাঁর সন্ধানে এসেছ, তিনি স্ফটিক বেদীতে অপেক্ষা করে চলে গেছেন।

লক্ষহীরা—চলে গেছেন? কার সন্ধানে এসেছি আমি?

নাগদত্ত—মহাকবি কালিদাস পত্নীর—

লক্ষহীরা—কালিদাস পত্নী! তুমি কি করে জানলে?

নাগদত্ত—তিনি আমাকে বলে গেছেন, তোমাকে কবি কালিদাসের গৃহে পৌঁছে দিতে। এসো, আমার রথ তোমাকে বহন করতে প্রস্তুত।

লক্ষহীরা—আমি যাবো—তবে তোমার রথে নয়—আমার রথও প্রস্তুত।

নাগদত্ত—বেশ, যে রথে তোমার অভিরুচি।

[লক্ষহীরার প্রস্থান। পশ্চাতে নাগদত্তের প্রস্থান]

(কালিদাস ও কুসুমিকার প্রবেশ)

কালিদাস—কি আশ্চর্য, কোথায় গেল লক্ষহীরা? তাকে এই দিকে আসতে দেখেছ কুসুমিকা?

কুসুমিকা—হ্যাঁ, কবি, উড়ন্ত পারাবত তাঁর হাতে নেমে এসে পদ্ম-পাপড়ীতে লেখা কি একখানা চিঠি দিল। সেই

চিঠি পেয়েই দেবী আমায় কিছু না বলে এই দিকে ছুটে এলেন।

কালিদাস—কার লিপি? কি লেখা আছে তাতে?

কুসুমিকা—কিছুই জানি না দেব, শুধু এই জানি, পত্রখানি পাঠ করে দেবী একবার চমকে উঠলেন। তারপর নিঃশব্দে চলে এলেন এইদিকে।

কালিদাস—কিন্তু এখানে তো নেই তিনি! তবে কি রথে করে কোথাও চলে গেলেন?

কুসুমিকা—রথে করে কোথায় যাবেন? ঐ তো দেবীর রথ। কি সর্বনাশ! কবি, আগুন—আগুন…

কালিদাস—আগুন! কোথায়?

কুসুমিকা—মহাদেবীর রথে!

কালিদাস—লক্ষহীরার রথে আগুন! দেখতে দেখতে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল! তবে কি কেউ রথে তার গলিত লাক্ষা ঢেলে দিয়েছে?

(নেপথ্যে—রক্ষা কর, রক্ষা কর)

কুসুমিকা—ওই—ওই নারীকণ্ঠের আর্তনাদ—

কালিদাস—লক্ষহীরার আর্তনাদ!

কুসুমিকা—কি হবে, কি হবে মহাকবি—দেবী যে অগ্নিদগ্ধ হলেন!

কালিদাস—ভয় নেই কুসুমিকা, আমি যাবো, ওই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে লক্ষহীরাকে উদ্ধার করে আনব। লক্ষহীরা—লক্ষহীরা—

কুসুমিকা—দেবী—মহাদেবী—

(কুসুমিকার প্রস্থান। কালিদাস ছুটিয়া প্রস্থানোদ্যত, সত্যবতী ছুটিয়া আসিল।)

সত্যবতী—স্বামী—প্রভু—

কালিদাস—একি, সত্যবতী! তুমি—

সত্যবতী—আমি এসেছি প্রভু, তোমায় বরণ করে নিয়ে যাবো বলে।

কালিদাস—বরণমালা সাজিয়ে অপেক্ষা করগে সত্যবতী। ওই অগ্নিকুণ্ড মধ্য হতে এক বিপন্না নারীকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি। যদি ফিরে আসি তাহলে গ্রহণ করব তোমার বরমাল্য। তার পূর্বে নয়—

সত্যবতী—না—না—তোমায় আমি যেতে দেব না। ওই নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে তোমায় ঝাঁপিয়ে পড়তে দেব না!

(পদতলে পড়িল)

কালিদাস—আমায় যেতে হবে, যেতেই হবে সত্যবতী। পথ ছাড়, স্বামীকে কর্তব্যে বাধা দিও না!

সত্যবতী—কর্তব্য! কি তোমার কর্তব্য? এক নারীকে রক্ষা করতে আর এক নারীর সীমন্তের সিঁদুর মুছে দেবে? রাজনটীর জীবনের জন্য জীবন্ত মৃত্যু দেবে অগ্নিসাক্ষী করে বরণ করা তোমার ধর্মপত্নীকে? বেশ, তাই যদি তোমার কর্তব্য হয়, তুমি যাও, তবে, যাবার আগে নিজের হাতে এই সিঁদুর মুছে দিয়ে যাও…এ সিঁদুর মুছে দিয়ে যাও।

এ সিঁদুর নিজের হাতে মুছে না দিয়ে তুমি যেতে পারবে না—কিছুতেই যেতে পারবে না।

(কুসুমিকার পুনঃ প্রবেশ)

কুসুমিকা—কবি, কবি, এখনো নিশ্চল দাঁড়িয়ে? চারিদিক থেকে অগ্নিশিখা দেবীকে বেষ্টন করে ফেলেছে। মহাদেবী যে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন!

কালিদাস—লক্ষহীরা পুড়ে ছাই হয়ে গেল! সোনার প্রতিমা পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেল! হোক্ সব শেষ হয়ে যাক। সেই ছাই সর্বাঙ্গে মেখে আমি আজীবন শ্মশানে মশানে কেঁদে বেড়াব, অশ্রুধারায় সেই সোনার প্রতিমার স্মৃতি তর্পণ করব, তবু উপায় নেই—কুসুমিকা, বিধাতা যে বাঁধনে আমায় বেঁধেছেন···এ বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে যাবার আমার কোনো উপায় নেই।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কালিদাসের উজ্জয়িনীর গৃহ প্রকোষ্ঠ)

(কাব্য রচনা-মগ্ন কালিদাস। একটু
পরে সত্যবতীর প্রবেশ)

কালিদাস—এসো সত্যবতী বোসো।

সত্যবতী—না, আমি এখানে বসলে তোমার কাব্যরচনায় ব্যাঘাত হবে। আমি যাই, তুমি রচনা কর।

কালিদাস—কোন ব্যাঘাত হবে না দেবী। কেমন যেন একা বোধ করছি—তুমি বরং বোস, কথা বল।

সত্যবতী—দেখি, কতটুকু রচনা করলে?

(পুঁথি লইয়া দেখিল। বেদনাহত বিস্ময় তার চোখে।)

একি! মাত্র দুটি ছত্র রচনা করেছিলে, তাও কেটে দিয়েছো?

কালিদাস—কি করব, কিছুতেই কাব্যরচনায় মন বসাতে পারছি না।

সত্যবতী—কিন্তু এই তুমিই তো ঋতুসংহার, কুমার-সম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত প্রভৃতি মহাকাব্য দিনের পর দিন রচনা করেছ!

কালিদাস—তা করেছি। অবিরাম রচনা করে চলেছি। কিন্তু আজ বুঝি কালিদাসের সে লেখনী স্তব্ধ হয়ে গেছে দেবী, এত চেষ্টা করি তবু ভাষা খুঁজে পাই না—

সত্যবতী—বুঝেছি। আমারই জন্য তোমার এ দশা।

কালিদাস—তোমার জন্যে ?

সত্যবতী—বাণীর বরপুত্র তুমি। একদিন তোমাকে আমি করেছিলুম অপমান। তাই এ গৃহে আমার উপস্থিতিতে তোমার আরাধ্যাদেবী সংক্ষুব্ধা। তাইতো তোমার লেখনী আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কালিদাস—না, না দেবী—ও কথা বোল না। তুমি আমায় মহামূর্খ বলে ভৎ´সনা করেছিলে—তাইতো আমি প্রতিজ্ঞা করলুম—হয় বাগ্দেবীর করুণা লাভ করবো, নতুন নিরক্ষর ব্যর্থ জীবন বিসর্জন দেব। তুমি ভৎ´সনা করে আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিয়েছিলে, তাইতো আজ আমি মহাকবি কালিদাস।

সত্যবতী—তা যদি হয় তবে এত অনুরোধ করছি—এত মিনতি করছি—তবু তুমি কাব্য রচনা করছো না কেন ?

কালিদাস—কি করব দেবী, যখন সে দৈবীপ্রেরণা আসে, গঙ্গোত্রী ধারার মত স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহে সে আমার লেখনী-মুখে ঝরে পড়ে। কিন্তু আজ—কি যেন এক বিরাট শিলাস্তূপ কল্পনার উৎসমুখ আবদ্ধ করে দিয়েছে। সমস্ত অন্তর জুড়ে যেন পাষাণের ভার বহন করছি। পারি না সত্যবতী, এ বোঝা আর আমি বইতে পারি না।

সত্যবতী—প্রভু, তবে কি সেই লক্ষহীরার স্মৃতি ?

কালিদাস—বোল না, বোল না সত্যবতী, লক্ষহীরার কথা বোল না। আর যে কোন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাও

করো—শুধু ঐ একটি নাম আমার সামনে উচ্চারণ কোর না। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! যাক্ তার স্মৃতি নিঃশেষ হয়ে যাক্, ছাই হয়ে যাক্।

সত্যবতী—প্রভু—

কালিদাস—তুমি চিন্তা কোর না। আমি রচনা করব—আবার কাব্য রচনা করব। তবে—তবে—আরও কিছুদিন আমায় অবসর দাও। চোখের সম্মুখে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখেছি, তার জ্বালাময়ী স্মৃতি নিঃশেষে মুছে যেতে আরও কিছুদিন—কিছুদিন সময় দাও সত্যবতী।

সত্যবতী—বেশ, আমি তোমাকে আর কিছু বলবো না! যেদিন তোমার মন চাইবে—সেইদিন তুমি রচনা কোর।

(প্রস্থানোদ্যতা। নেপথ্যে বিক্রমাদিত্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া থামিলেন।)

বিক্রমাদিত্য—(নেপথ্যে) আমি কি আসতে পারি মহাকবি?

কালিদাস—কে! সম্রাট! সুস্বাগত, সুস্বাগত ভারতেশ্বর। সত্যবতী, যাও—সম্রাটের জন্য পাদ্য অর্ঘ নিয়ে এসো।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রমাদিত্য—কোন প্রয়োজন নেই কবি। পরিচয় না করিয়ে দিলেও অনুমান করছি আমার সম্মুখে যিনি উপস্থিত তিনিই—

কালিদাস—আমার পত্নী সত্যবতী।

সত্যবতী—জয়তু ভারতেশ্বর সম্রাট বিক্রমাদিত্য—

বিক্রমাদিত্য—সম্রাট! হ্যাঁ, আমি ভারতের সম্রাট। কিন্তু

ভারতীর বরপুত্রের কাছে সম্রাট নই—তাঁর মিত্র। কবি পত্নী আমাকে সখা সম্বোধন করলে আনন্দিত হব।

সত্যবতী—গুণগ্রাহী ভারতেশ্বরের এই সদাশয়তায় আমি ধন্য।

বিক্রমাদিত্য—কিন্তু কবিবর, তোমার বিরুদ্ধে কবিপত্নীর নিকট আমার অভিযোগ আছে। তাঁর নিকট আমি বিচারপ্রার্থী। আশা করি তিনি পক্ষপাতিত্ব না করে সুবিচারই করবেন।

সত্যবতী—আপনার অভিযোগ কি—তা আগে জানা আবশ্যক।

বিক্রমাদিত্য—অভিযোগ এই যে আজ সাতদিন কবির অনুপস্থিতিতে নবরত্নসভা চন্দ্রমাহীন আকাশের মত পরিম্লান! মেঘদূতের যক্ষরাজ দীর্ঘ বিরহ অন্তে অলকাপুরীতে প্রিয়তমা সান্নিধ্যলাভ করে আমাদের কি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে গেলেন?

সত্যবতী—না সম্রাট, মহাকবির সখা হয়েও আপনি তাঁর অন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি—এই বড় আশ্চর্য কথা।

বিক্রমাদিত্য—কেন? কেন?

সত্যবতী—অলকাপুরীর প্রিয়তমা সান্নিধ্য তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করেনি, প্রিয়তমা বিরহেই তিনি উন্মনা! মেঘদূতের দৌত্য কখনো শেষ হয় না। সে ভেসে চলে বর্ষে বর্ষে, যুগে যুগে।

বিক্রমাদিত্য—তা সত্য। কিন্তু—! কবি, এ কি, তোমার চোখ অশ্রুসিক্ত!

সত্যবতী—সম্রাট! লক্ষহীরা কেমন করে অগ্নিদগ্ধ হল সে বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করেছেন?

বিক্রমাদিত্য—লক্ষহীরা! হ্যাঁ, অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু এখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। ভালো কথা, শুনেছ কবি, সেই দিন থেকে নগরনটী রত্নমালাও নিরুদ্দেশ।

কালিদাস—রত্নমালা!

বিক্রমাদিত্য—হ্যাঁ, ভোজরাজের ইন্দ্রনীল প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সে ঐ রাত্রেই কন্দর্প-মন্দিরের কাছে এসেছিল। তারপর থেকে কেউ নাকি তার সন্ধান জানে না। আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষহীরার দগ্ধরথের নিম্নে একটি হস্ত-স্খলিত হীরকবলয় পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে জেনেছি সে বলয় নগরনটী রত্নমালার।

কালিদাস—লক্ষহীরার রথের নিম্নে রত্নমালার বলয় কি করে এল সম্রাট?

বিক্রমাদিত্য—ঠিক বুঝতে পারছি না কবি। রথের সামনে পড়েছিল লক্ষহীরার সারথী মাল্যবানের রক্তাপ্লুত দেহ। সম্ভবতঃ কোন আততায়ী তাকে বধ করেছে।

কালিদাস—লক্ষহীরার সারথীকে নিহত করে তবে কি কেউ রথে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে?

বিক্রমাদিত্য—আগুন যে দৈবাৎ লাগেনি—এ যে কারো পৈশাচিক চক্রান্ত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

কালিদাস—লক্ষহীরাকে এ ভাবে দগ্ধ করবে—কার এমন পৈশাচিক প্রতিহিংসা?

বিক্রমাদিত্য—লক্ষহীরার রথে যে দগ্ধ হয়েছে—সে সত্যই

লক্ষহীরা কিনা—তা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না কবি—

কালিদাস—তবে—তবে কে দগ্ধ হয়েছে সম্রাট !

বিক্রমাদিত্য—যদি রত্নমালা হয় ?

কালিদাস—রত্নমালা !—

বিক্রমাদিত্য—স্মরণ করে দেখ, সেই রাত্রে একটি পারাবতবাহী লিপিকা পেয়ে লক্ষহীরা কন্দর্প মন্দির থেকে চলে যায়। সংবাদ নিয়ে জেনেছি—রত্নমালার পারাবতটিই লিপি বহন করে এনেছিল লক্ষহীরার কাছে। সে লিপি রত্নমালার না আর কারও তা বলতে পারি না। তবে পারাবতটি আমি সঙ্গে করে এনেছি।

সত্যবতী—সম্রাট ! সম্রাট !

বিক্রমাদিত্য—কি. কি হল দেবী ?

সত্যবতী—স্বামীকে বলিনি, আপনাকে জানাইনি। কিন্তু আর না বলে পারছি না। সম্রাট, পারাবত লক্ষহীরার কাছে যে পত্র নিয়ে গিয়েছিল—সে পত্র রত্নমালা লেখেনি—

বিক্রমাদিত্য—তবে ?

সত্যবতী—সে পত্র লিখেছিলুম আমি !

কালিদাস—তুমি !

সত্যবতী—একজন আমার মন বিষিয়ে তুলেছিল তোমার এবং লক্ষহীরার কুৎসায়। তাই তারই নির্দেশে সত্যকথা জানবার জন্যে আমি লক্ষহীরাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

কালিদাস—কিন্তু রত্নমালার পারাবত তুমি কোথায় পেলে ?

সত্যবতী—আমি পাইনি। সেই ব্যক্তি পারাবত দিয়ে আমার লিপি পাঠিয়েছিল।

কালিদাস—সে ব্যক্তি কে ?

সত্যবতী—চিনি না। পূর্বে কখনো দেখিনি। তবে রাজপুরুষের মত পরিচ্ছদ। পরিচয় দিল সম্রাটের সে একজন অমাত্য।

বিক্রমাদিত্য—আমার অমাত্য! সত্যিই আমার অমাত্য হলে সে কখনো তা স্বীকার করতো না। মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে। আপনারই লিপির সাহায্যে সে লক্ষহীরাকে নির্জনস্থানে নিয়ে এসেছে। তারপর সম্ভবতঃ সে লক্ষহীরাকে বন্দিনী করে তাকে নিয়ে কৌশলে পালিয়েছে। এবং আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করবার জন্য লক্ষহীরার সারথী মাল্যবানকে হত্যা করে সেই রথে অন্য কোন নারীকে শৃঙ্খলিত করে অগ্নিদগ্ধ করেছে।

কালিদাস—কে, কে সে অভাগিনী নারী ?

বিক্রমাদিত্য—সে, সে—সম্ভবতঃ সে অভাগিনী রত্নমালা—

কালিদাস—আর সেই পলাতক আততায়ী ?

বিক্রমাদিত্য—সে—সে—

(বাণীকণ্ঠের প্রবেশ)

বাণীকণ্ঠ—কবি—বড় আশ্চর্য সংবাদ কবি—

কালিদাস—পুরোহিত!

বাণীকণ্ঠ—একি! ভারতেশ্বর বিক্রমাদিত্য! সম্রাট জয়তু—

বিক্রমাদিত্য—ইনি ?

কালিদাস—পৌণ্ড্রনগরীর সরস্বতী মন্দিরের পূজারী। বাণীকণ্ঠ।

বিক্রমাদিত্য—বাণীকণ্ঠ! কি সংবাদ ব্রাহ্মণ?

বাণীকণ্ঠ—এক বিচিত্র সংবাদ সম্রাট। পথ দিয়ে কবির রচিত মেঘদূতের শ্লোক গান করে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ একটি রক্তপদ্ম আমার মাথার ওপর ঝরে পড়ল। ওপরে তাকিয়ে দেখি প্রাসাদ শিখরে স্তিমিত দীপালোকে এক অপরূপ নারীমূর্তি। মূর্তি বহুদূরে, তবু মনে হলো বড় বিষণ্ণ, যেন বহুদূরের পরিম্লান নক্ষত্রের মত বেদনা-বিধুর। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালুম, জানতে চাইলুম—আমাকে কেন এ পুষ্প উপহার দেবী। মূর্তি কি বললো বুঝতে পারলুম না। অদৃশ্য হয়ে গেল। পদ্ম থেকে ঝরে পড়লো শুধু এক ফোঁটা চোখের জল না শিশির বিন্দু কে জানে!

কালিদাস—পূজারী, দেখাতে পার? আবার দেখাতে পার সেই মূর্তি!—

বাণীকণ্ঠ—নিশ্চয়ই পারব কবি। আমি তোমার রচিত শ্লোক গান করলে—আমার মন বলছে সে মূর্তি আবার এসে দেখা দেবে।

কালিদাস—আবার দেখা দেবে? সম্রাট—

বিক্রমাদিত্য—বুঝেছি কবি। আর বিলম্ব নয়। প্রস্তুত হয়ে এসো আমার রথে। এসো বাণীকণ্ঠ—।

[বাণীকণ্ঠ ও বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান

কালিদাস—সত্যবতী, আমার ভূর্জপত্র, লেখনী এখানেই থাক, দীপ জ্বেলে বসে থাকো। ফিরে এসে আমি এমন মহাকাব্য রচনা করবো যা—কালিদাসের পূর্ববর্তী সমস্ত রচনার মধ্যে হবে সর্বোত্তম, সর্বযুগের কবিকুল বন্দনীয়। আসি প্রিয়তমে :

সত্যবতী—একটু দাঁড়াও—

(সত্যবতী প্রণাম করিল)

কালিদাস—একি, তুমি কাঁদছো !

সত্যবতী—না—না—

কালিদাস—তোমার ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল আমার পায়ে পড়ল যে—!

সত্যবতী—অবাধ্য চোখ মানে না, আমি কি করব !

কালিদাস—সত্যবতী—

সত্যবতী—তুমি ভেবো না, ও আনন্দের অশ্রু। তুমি ফিরে এসে সর্বোত্তম, সর্বযুগ বন্দনীয় কাব্য রচনা করবে—সেই আনন্দে চোখে জল আসে। ও কিছু নয়। তুমি সফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসো স্বামী,—আমি তোমারই প্রতীক্ষায় দীপ জ্বেলে বসে থাকবো রাতের পর রাত, যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ইন্দ্রনীল প্রাসাদ সান্নিধ্য ॥ বাণীকণ্ঠ, বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসেব প্রবেশ।)

বিক্রমাদিত্য—ওই প্রাসাদ ?

বাণীকণ্ঠ—হ্যাঁ সম্রাট।

বিক্রমাদিত্য—এ যে ভোজরাজ নাগদণ্ডের ইন্দ্রনীল প্রাসাদ !

বাণীকণ্ঠ—ওই প্রাসাদ শিখর হতেই পদ্মটি এসে পড়েছিল আমার মাথায়।

বিক্রমাদিত্য—অনুমানে সবই বুঝতে পারছি। আমার এখানে থাকা আর উচিত নয়। আমাব রথের ধ্বজা দেখলেই ওরা চিনতে পারবে। পূর্বাহ্ণে সতর্ক হয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি।

কালিদাস—সম্রাট—

বিক্রমাদিত্য—হ্যাঁ ভাল কথা, জয়সেন, পারাবত।

(পাবাবত লইয়া জয়সেনেব প্রবেশ)

শোন কবি, এই পত্রবাহী পারাবতটি তোমার কাছে রেখে দাও। (কালিদাসের পিঞ্জর গ্রহণ) বাণীকণ্ঠের গীত ধ্বনিতে যদি সেই নারী মূর্তি প্রাসাদ শিখরে আবার দেখা দেয়, যদি বুঝতে পার, আমরা যাকে অনুমান করছি প্রাসাদ শিখরের নারীমূর্তি সেই—তাহলে পারাবত সাহায্যে তাকে সঙ্কেত বাণী জানিয়ে দিও। আমি রথ নিয়ে মহাবলাধ্যক্ষ জীমূতবাহনের গৃহে অপেক্ষা করছি--সংবাদ পেলেই সুসজ্জিত সেনাদল সহ আক্রমণ করব ইন্দ্রনীল প্রাসাদ,

ধ্বংস করব ভোজরাজের নীচ চক্রান্তজাল। এসো জয়সেন—

[জয়সেন ও বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান

কালিদাস—গাও বাণীকণ্ঠ, তুমি মেঘদূতের শ্লোক গান করো। আমি প্রাসাদ নিম্নে চলে যাচ্ছি। বাঞ্ছিতা নারী মূর্তি আবির্ভূতা হলে আমি ওখান থেকে পারাবত উড়িয়ে দেব প্রাসাদ চূড়ায়।

[কালিদাসের প্রস্থান

(বাণীকণ্ঠের গান)

গান

অলকে দেখিয়ো কুন্দ-কলিকা
করপুটে শতদল,
লোধ্রফুলের রেণু মেখে মুখ
করেছে সুনির্মল।
চূড়া বঙ্কিমে নব কুরুবক
কর্ণে শিরীষ ফুল,
সিঁথামূলে শোভে তব বিকশিত
নবীন কদম ফুল॥

(গানের শেষে কালিদাসের পুনঃ প্রবেশ)

কালিদাস—বাণীকণ্ঠ! বাণীকণ্ঠ!

বাণীকণ্ঠ—কি কবি?

কালিদাস—যা ভেবেছি তাই। ও নারী—বন্দিনী লক্ষহীরা।

বাণীকণ্ঠ—লক্ষহীরা!

কাসিদাস—হ্যাঁ, তোমার গান শুনে যেমনি সে প্রাসাদ শিখরে

দেখা দিল, আমি কমল-পত্রে নখক্ষত চিহ্ন দিয়ে তাকে লিপি পাঠিয়েছিলুম।

"আধো আলো ছায়ে পারি না চিনিতে
সঙ্কেতে কহ বালা,
তুমি কিগো সেই বিরহ-রূপিণী
অনল দহন জ্বালা?"

প্রত্যুত্তরে এই দেখ, সে লিখেছে নয়ন কজ্জল-রাগে এই লিপি—

"আমার বিরহে যে দাহ পেয়েছ
ক্ষমা কর প্রিয়তম,
সুন্দর হতে সুন্দর, এসো
মরণ-শিয়রে মম।"

বাণীকণ্ঠ—মরণ-শিয়রে মম! এ নিশ্চয় তবে বন্দিনী লক্ষহীরা!

কালিদাস—তুমি যাও, শীঘ্র সম্রাটকে সংবাদ দাও সসৈন্যে ইন্দ্রনীল প্রাসাদ বেষ্টন করতে।

বাণীকণ্ঠ—তাই যাচ্ছি কবি।

[বাণীকণ্ঠের প্রস্থান

কালিদাস—লক্ষহীরা! সুবর্ণ প্রতিমা তাহলে আজও বেঁচে আছে! হে দেবাদিদেব শঙ্কর, তাকে নিরাপদ কর—বন্ধন মুক্ত কর।

(শূরসেনের প্রবেশ)

শূরসেন—লক্ষহীরা বন্ধন মুক্ত হবে। কিন্তু সে ওভাবে নয় কবি।

কালিদাস—কে ! ভোজরাজের অনুচর শূরসেন ?

শূরসেন—হ্যাঁ, তুমি সম্রাটকে সংবাদ পাঠিয়ে মহাভুল করলে কবি, সম্রাট যদি এই ইন্দ্রনীল প্রাসাদ সসৈন্যে বেষ্টন করেন, তোমার কি বিশ্বাস, লক্ষহীরাকে তুমি মুক্ত করে নিতে পারবে ?

কালিদাস—কেন পারব না ?

শূরসেন—কেন ? তোমরা তাকে পাবার পূর্বেই প্রতিহিংসা অন্ধ নাগদত্ত তাকে হত্যা করবে।

কালিদাস—হত্যা করবে ?

শূরসেন—নিশ্চয় ! লক্ষহীরাকে গ্রহণ করতে চাও তো জীবিত অবস্থায় পাবে না, পাবে তার রক্তরঞ্জিত দেহ।

কালিদাস—না, না, সে আমি চাই না শূরসেন, তার চেয়ে লক্ষহীরা আজীবন বন্দিনী থাকে সেও ভাল।

শূরসেন—কিন্তু তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এখন আর তো ফেরবার উপায় নেই। সেনাদল নিয়ে সম্রাট সম্ভবতঃ এখনি চলে আসবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে লক্ষহীরার রক্তাক্ত দেহ।

কালিদাস—তবে—তবে কি হবে শূরসেন ? কি করে লক্ষহীরাকে রক্ষা করা যায় ?

শূরসেন—এক উপায় আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস কর তো বলি—

কালিদাস—সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি। বল—লক্ষহীরাকে বাঁচাতে যে কোন কাজ করতে আমি প্রস্তুত।

শূরসেন—তাহলে এসো আমার সঙ্গে, ছদ্মবেশে তোমাকে আমি ইন্দ্রনীল প্রাসাদে নিয়ে যাবো। সম্রাট এসে পৌঁছবার পূর্বেই নাগদত্তের অজ্ঞাতসারে লক্ষহীরাকে নিয়ে তুমি গুপ্তদ্বার পথে পলায়ন করবে।

কালিদাল—বেশ চল।

শূরসেন—কিন্তু এক শর্ত, সম্রাট যখন আমাদের বন্দী করবেন প্রতিজ্ঞা কর তুমি, আমাকে মুক্ত করে দেবে ?

কালিদাস—প্রতিজ্ঞা করছি—নিশ্চয় তুমি মুক্তি পাবে।

শূরসেন—তাহলে এস, খুব সন্তর্পণে—নাগদত্ত যেন দেখতে না পায়, এতটুকু সন্দেহ না করে, খুব সাবধান।

কালিদাস—আমি খুব সন্তর্পণে নিঃশব্দেই যাবো, চলো—

[শূরসেন ও কালিদাসের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

(ইন্দ্রনীল প্রাসাদের কক্ষ)

(নাগদত্ত ও লক্ষহীরা)

নাগদত্ত—তুমি সুচতুরা নায়িকা। পারাবত যোগে তুমি কালিদাসকে সংবাদ পাঠিয়েছ যে মুহূর্তে, তখনই আমি তোমার চাতুরি ধরে ফেলেছি।

লক্ষহীরা—গৃহস্থ কুলবধূকে যারা চাতুর্য শিক্ষা দিয়ে নায়িকারূপে নগর-বিপণিতে পাঠায় তুমি তাদেরই অগ্রগামী। তোমার মত পুরুষের সাহচর্যেই গৃহ-কপোত

হয়ে ওঠে বিষধর তক্ষক। নায়িকার চাতুর্য যে তোমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না তাতে বিস্ময়ের কি আছে ভোজরাজ ?

নাগদত্ত—স্তব্ধ হোক তোমার বাচালতা। জানো, তোমারই জন্য রত্নমালা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ?

লক্ষহীরা—বল কি মহাত্মন—আমারই জন্যে ?

নাগদত্ত—হ্যাঁ, তোমাকে পাব, তোমাকে নিয়ে আমি নিরাপদে পালিয়ে যাবো, কেউ সন্দেহ করবে না···শুধু এই আশাতেই রত্নমালাকে তোমার রথে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, আমি সেই রথে অগ্নিসংযোগ করেছিলুম। ভেবেছিলুম সবাই বিশ্বাস করবে লক্ষহীরা আগুনে পুড়ে মরেছে—কিন্তু—

লক্ষহীরা—কিন্তু এ হীরা আগুনে পোড়ে না—আগুনের তাপে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, হীরক চোরকে ধরিয়ে দেয়। অন্ধকারের পেচককে টেনে আনে প্রকাশ্য দিবালোকে। সবার সামনে তুলে ধরে তার বিকট-দর্শন মুখের স্বরূপ—তাই না ভোজরাজ ?

নাগদত্ত—লক্ষহীরা—

লক্ষহীরা—মুখখানিকে পেচকের মুখের সঙ্গে তুলনা করলুম বলে ক্রোধ হচ্ছে নাকি ?

নাগদত্ত—পেচকের মুখ ! অথচ এই পেচক মুখের আকর্ষণেই বালবিধবা তুমি একদিন অনায়াসে সমাজের মুখে কালি দিয়ে চলে এসেছিলে ঘর ছেড়ে।

লক্ষহীরা—চন্দ্র-গোলাকৃতি পেচকের মুখও ঠিক তদ্রূপ। তাই

বালিকা বয়সে যাকে চন্দ্র মনে করেছিলাম। যেদিন জানলুম তার আসল পরিচয়—সে মূর্তিমান কালপেঁচা সেইদিনই সরে এলুম তোমার বিবর থেকে।

নাগদত্ত—থাক, যথেষ্ট হয়েছে। বল, কালিদাসকে তুমি পারাবত দিয়ে কি সংবাদ পাঠিয়েছ?

লক্ষহীরা—সে সংবাদ বরং কালিদাস যখন আসবেন তার মুখেই শুনবে।

নাগদত্ত—কালিদাস এখানে আসবে?

লক্ষহীরা—আসতেও পারেন।

নাগদত্ত—বটে। তুমি তাকে আমন্ত্রণ করেছ নাকি?

লক্ষহীরা—দৈবপুরুষ যখন আসেন তিনি বিনা আমন্ত্রণেই আসেন।

নাগদত্ত—এই ইন্দ্রনীল প্রাসাদে বিনা আমন্ত্রণে যিনি আসবেন স্থির জেনো তিনি দৈবপুরুষ নন, নিয়তিরূপিণী নারীই তাকে আকর্ষণ করে আনবে।

লক্ষহীরা—কে সেই নিয়তিরূপিণী?

নাগদত্ত—ধীরে সুন্দরী—ধীরে, সময়ে সব জানবে। তার আগে আমি তোমার স্পষ্ট উত্তর শুনতে চাই—তুমি আমার সঙ্গে উজ্জয়িনী ছেড়ে আমার স্বরাজ্যে যাবে কি না—

লক্ষহীরা—না—

নাগদত্ত—না! যদি জোর করে নিয়ে যাই?

লক্ষহীরা—এক অসতর্ক মুহূর্তে আমায় রথে তুলে এনেছ বলে মনে কোর না ভোজরাজ, তোমার ভোজবিদ্যায় আবার আমাকে জয় করতে পারবে!

নাগদত্ত—কে বাধা দেবে শুনি ?

লক্ষহীরা—বাধা দেবে আমারই দুটি হাত। (ছুরি দেখাইয়া) ডান হাতে যা দেখছ এ আমন্ত্রণ করবে তোমাকে। আর বাঁ হাতের আঙ্গুলে এই বিষের আংটি, যখনই প্রয়োজন হবে, সখী সম্ভাষণ করবে আমাকে।

নাগদত্ত—কি আশ্চর্য ! তুমি আমার প্রাসাদের বন্দিনী। ছুরিকা সংগ্রহ করলে কি করে ?

লক্ষহীরা—যার অপাঙ্গে রয়েছে মোহিনী মায়া, কণ্ঠে রয়েছে লক্ষহীরকের মালা—বন্দিনী অবস্থাতে তার পক্ষে একখানা ছুরিকা যোগাড় করা খুব দুঃসাধ্য কাজ নয় ভোজরাজ।

[লক্ষহীরার প্রস্থান

নাগদত্ত—বিষধরা কালনাগিনী, দুঃখ এই যে তোমার বিষদাঁত এখনও উপড়ে ফেলতে পারলুম না। দেখা যাক—

(শূরসেনের প্রবেশ)

শূরসেন—সর্বনাশ হয়েছে মহারাজ, কবি কালিদাসের আহ্বানে সম্রাট বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে বেষ্টন করতে আসছেন এই প্রাসাদ।

নাগদত্ত—সে কি ? শীঘ্র তোরণ-দ্বার বন্ধ কর।

শূরসেন—সে ব্যবস্থা আমি পূর্বেই করেছি মহারাজ, প্রাসাদ-রক্ষী ছুটে গেছে তোরণ রক্ষা করতে। কিন্তু জলস্রোতের ন্যায় সম্রাটের বিপুলবাহিনা এখনি এসে পড়বে, কতক্ষণ বাধা দেব আমরা ?

নাগদত্ত—তবে উপায় !

শূরসেন—ইন্দ্রনীল-প্রাসাদের গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ তাদের অজ্ঞাত। সেই সুড়ঙ্গ পথ ধরে আসুন আমরা শিপ্রা নদীর পরপারে চলে যাই।

নাগদত্ত—যাবো। কিন্তু তার আগে···শূরসেন, তোমাকে যে তখন গোপন ইঙ্গিতে জানালুম কালিদাসকে ছলনা করে এই প্রাসাদে নিয়ে আসতে—পারনি আনতে ?

শূরসেন—এনেছি মহারাজ, তাকে ছদ্মবেশে নিয়ে এসেছি। আপনার নির্দেশিত স্থানেই তাকে অপেক্ষা করতে বলে এসেছি।

নাগদত্ত—শোনো, এবার এক কাজ করো—

(কানে কানে কি যেন বলিল। এই সময়ে লক্ষহীরা প্রবেশ করিল। অপাঙ্গে তাহাকে দেখিয়া লইয়া দু'জনেই না দেখার অভিনয় করিল। নাগদত্ত শূরসেনের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।)

বিশ্বাসহন্তা! প্রভুদ্রোহী দুর্বৃত্ত। তোমায় আমি হত্যা করব।

শূরসেন—ছাড়ুন—ছাড়ুন মহারাজ, আপনি ভুল সংবাদ পেয়েছেন, আপনার পাদস্পর্শ করে বলছি—আমি প্রভুদ্রোহী নই।

নাগদত্ত—প্রভুদ্রোহী নও ? আমি সংবাদ পেয়েছি তুমি কবি কালিদাসকে গোপনে এই প্রাসাদ মধ্যে নিয়ে এসেছ।

শূরসেন—আমি! কালিদাসকে এনেছি এই প্রাসাদে! না না মহারাজ, আপনার পরম শত্রুকে আমি এখানে আনতে

পারি না। ঈশ্বর সাক্ষী, অন্নদাতার সঙ্গে এতবড় ছলনা আমি করিনি, করতে পারি না।

নাগদত্ত—উত্তম। এখনকার মত নিষ্কৃতি দিচ্ছি তোমায়, কিন্তু নিশ্চিত জেনো—কালিদাস যদি সত্যই এসে থাকে এই সর্পবিবরে, জীবন্ত অবস্থায় সে ফিরে যেতে পারবে না। গুপ্ত আততায়ীর হস্তে হবে তার অপমৃত্যু।

[প্রস্থান

শূরসেন—একি সর্বনাশ করলুম আমি! কালিদাসকে প্রাসাদে যে জন্যে নিয়ে এলুম, সে কাজতো হল না। পরিবর্তে আততায়ীর হস্তে নিহত হবে কালিদাস! কি করি! এখন আমি কি করি!

(লক্ষহীরা সামনে আসিল)

লক্ষহীরা—শূরসেন—

শূরসেন—কে! মহাদেবী! আমি সর্বনাশ করেছি মহাদেবী! অকারণে কবি কালিদাসকে ঘাতকের অস্ত্রের মুখে এগিয়ে দিয়েছি।

লক্ষহীরা—কি হয়েছে সংক্ষেপে বল।

শূরসেন—সংক্ষেপেই বলছি, আমি কবি কালিদাসকে এই প্রাসাদে এনেছি আপনাকে নিয়ে তিনি এখান থেকে পালিয়ে যাবেন এই উদ্দেশ্যে।

লক্ষহীরা—তুমি এনেছ? নাগদত্তের ডান হাত তুমি, হঠাৎ তোমার এ পরোপকারের অভিলাষ হল কেন?

শূরসেন—সম্রাট বিক্রমাদিত্য প্রাসাদ অধিকার করতে আসছেন।

তাঁর হাতে বন্দী হতে হবে, হয়তো মৃত্যু বরণ করতে হবে। তাই কবির সঙ্গে শর্ত হয়েছিল আমার—তিনি সম্রাটকে বলে আমায় মুক্তি দেবেন, আর আমি মুক্তি দেব আপনাকে।

লক্ষহীরা—সত্য বলছ?

শূরসেন—মৃত্যু যার শিওরে, সে কেন মিথ্যা বলবে মহাদেবী? কবিকে নিয়ে এলুম কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলুম না, সন্দিগ্ধ নাগদত্ত তাঁকে হত্যা করার জন্য আততায়ী নিযুক্ত করেছে।

লক্ষহীরা—মহাকবি এমন নিরাপদ আছেন তো? কোথায়? কোথায় রেখে এসেছ তাঁকে?

শূরসেন—ঐ তমালদিঘির ওপারে একটি নিভৃত স্থানে।

লক্ষহীরা—তমালদিঘির ওপারে! চলো, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

শূরসেন—মার্জনা করবেন মহাদেবী, এখন আর সে সাহস আমার নেই। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে অগ্রসর হতে দেখলেই নাগদত্তের সন্দেহ আরও দৃঢ় হবে, সে বুঝতে পারবে কোথায় আমাদের গন্তব্যস্থল। বিপন্ন হবে আমাদের জীবন, আর সেইসঙ্গে বিপন্ন হবেন মহাকবি—

লক্ষহীরা—সত্য বলেছ, কবি তাহলে বিপন্ন হবেন।

শূরসেন—আপনি বরং অপেক্ষা করুন। সম্রাট-সৈন্য তোরণ-দ্বার ভেঙ্গে ফেলে শীঘ্রই এখানে আসবে। তাদের সাহায্যে—

লক্ষহীরা—কিন্তু সেই অবসরে যদি নাগদত্ত কবির সন্ধান পায় ?

শূরসেন—সত্য, সে সম্ভাবনাও রয়েছে—

লক্ষহীরা—কি ভুল তুমি করেছ শূরসেন ! উপকার করতে এসে কি ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে টেনে এনেছ মহাকবিকে ! না না, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না, আমি যাবো তমালদিঘির পারে মহাকবির কাছে।

শূরসেন—কিন্তু একা, এমন নিরস্ত্র অবস্থায় ?

লক্ষহীরা—আমি নিরস্ত্র নই, সঙ্গে আমার এই ছুরিকা—

শূরসেন—সশস্ত্র আততায়ীর সামনে ছুরিকা দিয়ে আত্মহত্যা করা চলে, আত্মরক্ষা করা চলে না। বিশেষতঃ কবিকে সত্যই যদি কোন আততায়ী আক্রমণ করতে ধেয়ে আসে তখন ?

লক্ষহীরা—তখন—তখন ? শূরসেন, তোমার ঐ তীরধনুকটি আমায় দাও।

শূরসেন—তীর ধনুক—

লক্ষহীরা—লক্ষহীরার হস্ত-নিক্ষিপ্ত তীর, তার অপাঙ্গ তীরের চেয়ে কম শানিত নয়, দুটি তীরই সমান অব্যর্থ—সেকথা উজ্জয়িনীর রঙ্গভূমিতে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

শূরসেন—শুনেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, রঙ্গভুমিতে দেবীর শরক্ষেপ কৌশল আমি কখনো দেখিনি। তাই ভয় হয় নিজের অস্ত্র দেবীর হাতে তুলে দিতে। আর কোন প্রকারে তাঁর সন্ধান যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আমার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত—

লক্ষহীরা—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো শূরসেন। লক্ষ্য আমার ব্যর্থ হবার নয়।

শূরসেন—মার্জনা করবেন, কোন প্রমাণ ?

লক্ষহীরা—কি প্রমাণ চাই বলো ? কোন লক্ষ্যে শর-সন্ধান করব ?

শূরসেন—লক্ষ্য ! (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া) হ্যাঁ হয়েছে, ঐ যে প্রাসাদ প্রাচীরের ওপর দিয়ে একটি অশোক শাখা উঠে এসেছে ওতে রয়েছে একটি অশোকগুচ্ছ, ঐ অশোক-স্তবককে লক্ষ্য করে শরক্ষেপ করুন। যদি সফলকাম হন, আমার এই ধনুবাণ আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না। এই অস্ত্র নিয়েই আপনি এগিয়ে যাবেন কালিদাসকে রক্ষা করতে।

(ধনুর্বাণ দিল। লক্ষহীরা তীর যোজনা করিল)

লক্ষহীরা—বেশ ! এই দেখ লক্ষহীরার হাতের অব্যর্থ সন্ধান।

(তীরক্ষেপ—নেপথ্যে আর্তনাদ। নাগদত্ত তীর সন্ধানের সময় পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।)

একি ! আর্তনাদ করল কে ?

নাগদত্ত—অশোক শাখার অন্তরালে আমরা লুকিয়ে রেখেছিলুম যাকে—আর্তনাদ করল সে।

[নাগদত্ত ও শূরসেনের প্রস্থান

লক্ষহীরা—অশোক শাখার অন্তরালে কে ! কে তুমি।

(ছুটিয়া গেল পত্রকুঞ্জ মধ্যে রক্তাক্ত কালিদাসের কাছে)

কালিদাস—লক্ষহীরা—

লক্ষহীরা—একি! তীরবিদ্ধ রক্তাক্ত মহাকবি! তুমি এখানে কেমন করে এলে?

কালিদাস—তোমারই প্রতীক্ষায়, ওরা রেখে গিয়েছিল আমাকে এই অশোক-স্তবকের অন্তরালে—

লক্ষহীরা—আমাকে বাঁচাতে এসে আমারই নিক্ষিপ্ত তীরে… কবি! কবি!

কালিদাস—শোক কোরো না! আমার বুকে এ রক্তচিহ্ন নয়, এ অশোক-স্তবক, তীরের মুখে তুমি আমায় দিয়েছ এই অশোক-চিহ্ন। তোমার অনুরাগ-রাঙা অশোক-চিহ্ন।

লক্ষহীরা—কবি, কবি, এই যদি নিয়তির বিধান হয় তবে সব শোক মুছে যাক, শেষ হয়ে যাক সব দুঃখ—লক্ষহীরার এই বিষামৃত পানে।

(বিষের আংটি মুখে ধরিল)

(নেপথ্যে বিক্রমাদিত্যের কণ্ঠস্বর—"কবি, কবি, কোথায় তুমি মহাকবি।" প্রবেশ করিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে তাঁহার বাণীকণ্ঠ, জয়সেন ও শৃঙ্খলা-বদ্ধ নাগদত্ত ও শূরসেন।)

বিক্রমাদিত্য—এ কি। মহাকবি।…কে এই সর্বনাশ করলে?

লক্ষহীরা—আমি!

বিক্রমাদিত্য—তুমি! এও কি সম্ভব। রাজনটী লক্ষহীরা, কবি-কালিদাসের হত্যাকারী তুমি!

কালিদাস—না মহারাজ, লক্ষহীরা নয়, জীবনের প্রথম শ্লোক

রচনায় অজ্ঞাতে অপরাধ করেছিলুম বাগ্‌দেবীর কাছে—আজ জীবনান্তকালে লক্ষহারার অজ্ঞাতে তারই হাত ধরে নেমে এল কুপিতা সরস্বতার অভিশাপ। এসো অভিশাপ-রূপিণী, এসো মৃত্যুরূপা মানস-সুন্দরী, তোমারই হাত ধরে চলে যাই দূরে—বহু দূরে···ওই সারস্বত মণ্ডলের মাঝখানে।

(বিষপানে মৃতপ্রায় লক্ষহারার বুকে ঢলিয়া পড়িলেন)

যবনিকা